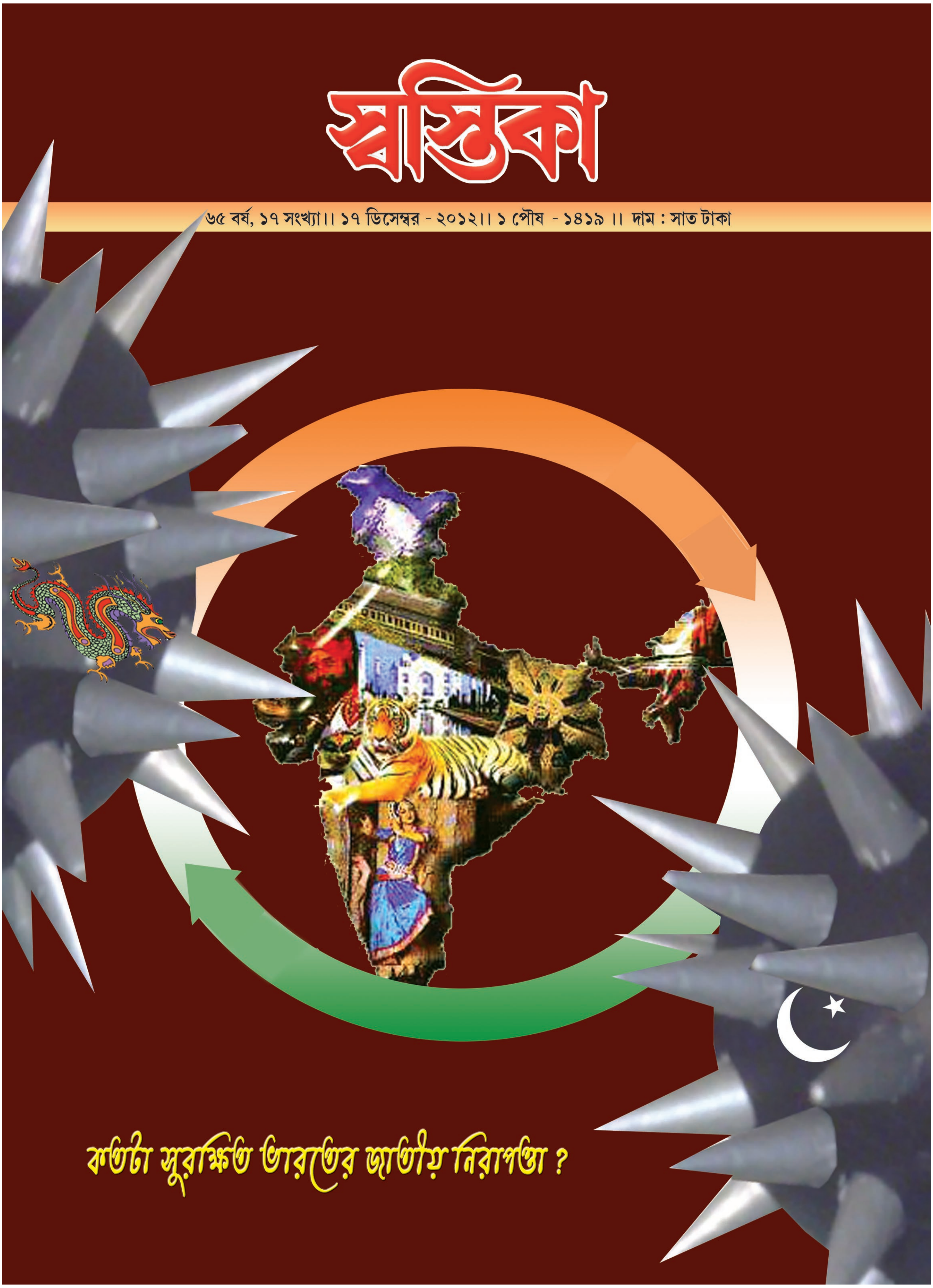
স্বস্তিকা
৬৫ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ১৭ ডিসেম্বর - ২০১২।। ১ পৌষ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা
কতটা সুরক্ষিত ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ?

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮
এফ ডি আই নিয়ে মাত্র এক বছরেই সোনিয়া-মনমোহনের মত বদল— বিদেশী অর্থের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না কি? □ ৯
পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে সংঘর্ষের আশঙ্কা □ ১০
খোলা চিঠি : গণতন্ত্রে হাতির হানা, দোসর সাইকেল □ সুন্দর মৌলিক □ ১১
চীনের নতুন সরকার কি আরও আগ্রাসী হতে চলেছে □ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় □ ১২
জাতীয় সুরক্ষা ও চীনের আগ্রাসী মনোভাব □ তরুণ শাণ্ডিল্য □ ১৪
সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ থেকে আমরা কিছু শিখিনি □ নীতিন রায় □ ১৬
ঐতিহাসিক দুর্গ 'জালোর' □ সোমশুভ্র চক্রবর্তী □ ২১
পল্লী বাংলার সর্বজনীন উৎসব নবান্ন □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ২২
অঙ্গনা : ভারতবর্ষে পঞ্চায়েতে নারী □ প্রীতি বসু □ ২৬
পরিবর্তনের জন্য চাই ভারতীয় মূল্যবোধভিত্তিক বিকল্প সংবাদমাধ্যম □ বৃজকিশোর কুঠিয়াল □ ২৭
পাক সীমান্তে মাছিটাও চোখে পড়ছে আর বাংলাদেশ সীমান্তে হাতিও নজরে আসে না কেন? □ সাধন কুমার পাল □ ৩০
সুস্বাস্থ্য : সুন্দর হাসি □ ডাঃ দীপ্তিময় দত্ত □ ৩৬-৩৭
খেলা : বিশ্বসমাজে কলঙ্কিত ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন □ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৯
নজরে বিবেকানন্দ যুব শিবির : প্রস্তুতি তুঙ্গে গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে □ বিরাজ রায় □ ৪২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □
অন্যরকম : ৩২ □ □ স্মরণে : ৩৩ □ □ উত্তরবঙ্গ : ৩৪
□ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৫ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১ পৌষ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৭ ডিসেম্বর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কতটা সুরক্ষিত জাতীয় নিরাপত্তা?
পৃঃ ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় :

সরকারি রোষানলে অডিট রিপোর্ট

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের প্রতিমন্ত্রী ভি নারায়ণস্বামী তির্যক মন্তব্য করেছেন কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ)-এর বিরুদ্ধে। ক্যাগ যেভাবে একের পর এক কেন্দ্রের আর্থিক দুর্নীতি ফাঁস করছে, তাতে মহাবেকায়দায় পড়েছে কেন্দ্র। অন্যদিকে ক্যাগের রাজ্য সংস্থা এ-জি বেঙ্গল কলকাতা পুরসভার ত্রিফলা আলো নিয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে দুর্নীতির আশঙ্কাই সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ফলে রাজ্য সরকারের কোপে এজি বেঙ্গল। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারি অডিট রিপোর্ট বারবার কেন সরকারেরই রোষানলে পড়বে? দলীয় রাজনৈতিক আনুগত্য কি এতটাই সংকটে ফেলেছে দেশের গণতন্ত্রকে! বিশ্লেষণে— ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, দেবব্রত চৌধুরী প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

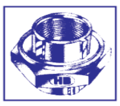
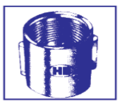

HB ®
AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE ®
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের পরিহাস

সম্প্রতি এফ ডি আই লইয়া সংসদের উভয় কক্ষে ভোটের নামে যে তামাশা চলিল তাহা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে চরম লজ্জার বিষয়। বিতর্ক চলাকালীন ১৮টি দলের মধ্যে ১৪টি রাজনৈতিক দলের নেতারা খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির বিরোধিতা করিয়া বক্তব্য রাখিয়াছিলেন। এই ১৪টি দলের মোট সাংসদ সংখ্যা ২৮৪ জন। কংগ্রেসসহ মাত্র চারিটি দল খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির পক্ষে ওকালতি করিয়াছে। এই চারিটি দলের এখন লোকসভায় মোট ২২৪ জন সাংসদ রহিয়াছেন। ইহার অর্থ ১৪টি দলের ২৮৪ জন সাংসদ খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির লগ্নি বিরোধী। কিন্তু ভোটের ফলাফলে দেখা যাইতেছে মাত্র ২১৮ জন বিরোধিতা করিয়াছেন। অর্থাৎ ৬৬ জন এফ ডি আই বিরোধী সাংসদ বিরুদ্ধে ভোট দেন নাই। এই ৬৬ জন এফ ডি আই বিরোধী সাংসদ লোকসভায় বলিয়াছিলেন, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি আসিলে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জীবিকা বিপন্ন হইবে। কিন্তু ভোটাভুটির সময় কোনও এক অদৃশ্য কারণে এফ ডি আই-এর বিরুদ্ধে ভোট না দিয়া সরকারকে জয়ী হইতে সাহায্য করিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদের অভিমত একরকম আর ভোটদানের সময় সিদ্ধান্ত আর একরকম। এই ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে চরম লজ্জার। মূলত এফ ডি আই লইয়া আম আদমির স্বার্থ রক্ষার নাম করিয়া লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে আইনি স্বীকৃতি দিবার জন্য ভোটের নামে যাহা হইল তাহাকে তামাসা ছাড়া আর কিছুই বলা যাইবে না। আর্থিক সংস্কারের উদ্দেশ্যই হইল আম আদমির জন্য মেকি নিবেদিতপ্রাণ মনমোহন, সোনিয়া গান্ধীর দলের সদস্যদের দেশের সম্পদ ও বিত্তের লুণ্ঠনকে ত্বরান্বিত ও ব্যাপকতর করা। তাই টাকা আর সিবিআইকে ব্যবহার করিয়া জয়ী হইবার এই কদর্য প্রচেষ্টা। মুলায়ম ও মায়াবতীকে যে কৌশলে ভোটের সময় নিশ্চুপ করাইয়া কার্য হাসিল করা হইয়াছে তাহা পাড়ার ক্লাবে চলিতে পারে সংসদে নহে। ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ৬০ বছর পূর্ণ হইতেছে কিন্তু দেখা যাইতেছে বহু দলের নীতিহীন নেতারা সংসদকে কলুষিত করিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বহুজন সমাজ পার্টি লোকসভায় এফ ডি আই বিরোধী অবস্থান লইয়াছে, কিন্তু ভোটদানে বিরত রহিয়াছে। আবার রাজ্যসভায় এফ ডি আই বিরোধী অবস্থান লইয়াছে, কিন্তু সরকার পক্ষে ভোট দিয়াছে। বোঝা যাইতেছে এমন দলের নিকট নীতির কোনও মূল্য নাই, যাহা গণতন্ত্রের পক্ষে চরম ক্ষতিকর। সমাজবাদী পার্টিও একইভাবে দুমুখো আচরণ করিয়াছে। রাজ্যসভার নেতা অরুণ জেটলি ঠিকই বলিয়াছেন, ‘‘খুচরো ব্যবসায় এফ ডি আই লইয়া মনমোহন সরকারের সব তথ্য যুক্তিই ধোঁকাবাজি এবং ছলনা। সরকার ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে জবরদস্তি এই নীতি জারি করিতে পারে কিন্তু ভারত তাহা কখনই মানিয়া লইবে না। এই সরকারকে তাহার জন্য প্রতিদিন চড়া মাসুল দিতে হইবে।’’ ১৯৯৩ সালেও সংখ্যালঘু নরসিমা সরকার অনাস্থা ভোট ম্যানেজ করিয়া জিতিয়াছিল। তাহার পরে ঝাড়খন্ড মুক্তিমোর্চা-কেলেঙ্কারি ফাঁস হইয়াছিল। ২০০৮ সালেও আস্থা ভোটে সংখ্যালঘু মনমোহন সরকার জয় ম্যানেজ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নোট দিয়া ভোট কিনিবার ‘ক্যাশ ফর ভোট কেলেঙ্কারি’ সমগ্র দেশে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইবার কি হইবে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। অনৈতিক উপায়ে জয় হাসিল করিয়া কংগ্রেস বলিতেছে ‘যো জিতা ওহি সিকন্দর’। এখানে নীতি-নৈতিকতার কোনও স্থান নেই। ভবিষ্যৎ বলিতেছে এই সরকার ক্ষমতায় থাকিলে আগামীদিনে চুরি করিবার অধিকারও সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাইলে বিস্ময়কর কিছু হইবে না। ৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সংসদীয় গণতন্ত্রে সেই দিনের পূর্বাভাষ দেখা যাইতেছে কংগ্রেসী সৌজন্যে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পারো, বিশ হাজার রাজনীতিক সম্মেলন করিতে পারো, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পারো—এ-সবে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আবির্ভূত হয়, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় জাগ্রত হয়, যে-হৃদয় সকলের জন্য অনুভব করে। যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা দেখা দেয়, যতদিন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী কর্মজীবনে পরিণত হয়, ততদিন আমাদের আশা নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংবাদ প্রতিবেদন

ভোট রাজনীতির স্বার্থে অনুপ্রবেশ সমস্যাকে এড়ানো চলবে না : ভাইয়াজী যোশী

বিক্রম রাও-এর হাতে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন ভাইয়াজী।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অনুপ্রবেশ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নয়। এটা ভারতীয় ও বিদেশী নাগরিকদের সম্পর্কের প্রশ্ন। অনুপ্রবেশ শুধু সীমাবর্তী ক্ষেত্রের নয়, সারাদেশের পক্ষেই উদ্বেগের বিষয়। এটা বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ— নীরব আক্রমণ। ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে এই সমস্যাকে এড়িয়ে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে জিততে পারে, কিন্তু নবীন প্রজন্মের কাছে এক চির-সংকট রেখে যাবে। সাম্প্রতিক কোকরাঝাড়ের ঘটনাই প্রমাণ করে দিয়েছে অনুপ্রবেশ এক রাষ্ট্রীয় চ্যালেঞ্জ। গত ৯ ডিসেম্বর 'অনুপ্রবেশ—এক রাষ্ট্রীয় চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়ে এই বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী)। শ্রী বড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয় কলকাতায় মহাজাতি সদনে (অ্যানেক্স) এই সভার আয়োজন করে। উপলক্ষ— পণ্ডিত বচনেশ ত্রিপাঠী স্মৃতি ব্যাখানমালা এবং ভানুপ্রতাপ শুক্ল স্মৃতি রাষ্ট্রধর্ম সম্মান ২০১২। পশ্চিমবঙ্গ অভিলেখাগারের প্রাক্তন নির্দেশক ডঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সভাপতি। শ্রী যোশী আরও বলেন, প্রায় ৩ থেকে ৫ কোটি অনুপ্রবেশকারী আজ সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। যে কোনও দেশই নির্দিষ্ট সময়ের পর বিদেশীদের থাকতে দেয় না। অনুপ্রবেশের কারণে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে কোকড়াঝাড়ের ঘটনাই তার প্রমাণ। বোড়োল্যান্ডে ৭০ শতাংশই বাংলাদেশী। কোকড়াঝাড়ের ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল মুম্বাইয়ের রাস্তায়। এটা কি দেশভক্তির প্রতীক? যারা হুমকি দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন না করে উল্টে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের মানুষ যাতে ফিরে যায় তার জন্য সরকার বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিল। সরকার তাদের সুরক্ষার গ্যারান্টি দিতে পারেনি।

ন্যাশানাল রেজিস্ট্রেশন (১৯৫১)-এর কাজ নতুন করে শুরু হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ১৯৫০-এর আগে যাদের বাবা-মা ভারতে জন্মেছেন তারাই ভারতের নাগরিক। এটা ভুল নীতি। কড়াভাবে সরকারের বিষয়টা দেখা দরকার। প্রয়োজনে ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত 'সীল' করে দিতে হবে। যে ৯০০ কিলোমিটার বেড়া দেওয়া হয়নি, সেখানে বেড়া দিতে হবে। জলপথে স্পীড বোড নামিয়ে নিরন্তর নজরদারি চালাতে হবে। বি এস এফ-কে গুলি চালানোর অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকায় হিন্দুদের পরম্পরাকে (মন্দির নির্মাণ, মেলা ইত্যাদি) রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটার তালিকাকে 'আপডেট' করতে হবে। বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। দল, সমাজ ও সরকারকে একযোগে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক কে বিক্রমরাও-কে এদিন ভানুপ্রতাপ শুক্ল স্মৃতি রাষ্ট্রধর্ম সম্মান-২০১২ জানানো হয়। সম্মানের প্রত্যুত্তরে শ্রীরাও অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশ নিজেদের এলাকায় রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ করতে দিচ্ছে না। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আনন্দ মিশ্র 'অভয়', প্রকাশ বেতালা, বিমল লাট, তথাগত রায় প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে শ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, দেশের পূর্বে অনুপ্রবেশ আর পশ্চিমে বিস্ফোরণ কেন হচ্ছে? রাষ্ট্রশক্তি বাধা না দিলে এই আক্রমণের মোকাবিলা করা যাবে না। আমাদের নেহেরুবাদী মানসিকতা (তোষণ ও ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা) থেকে মুক্ত হতে হবে। সকলকে ধন্যবাদ জানান যুগলকিশোর জৈথলিয়া। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পবনপুত্র বাদল।

সংবাদ প্রতিবেদন

মানবাধিকার ও স্বাধীন তিব্বতের দাবিতে কলকাতার রাজপথে তিব্বতীরা

কলকাতায় তিব্বতীদের বিক্ষোভ সমাবেশ। —ছবি : কৃশানু মিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের দিন কলকাতার রাজপথে নামলেন কয়েক হাজার তিব্বতী। ওইদিন সারা বিশ্বজুড়েই তিব্বতী নাগরিকদের সমর্থনে গোটা বিশ্বের মানুষ তাঁদের পাশে দাঁড়ান। গত নভেম্বর তিব্বতে চীনা-হানাদারির প্রতিবাদে ২৮ জন তিব্বতী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করার পর এই ঘটনা বিশ্বের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীন তিব্বতের দাবিতে এবং তিব্বতে দলাই লামার প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফেরানোর জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন আপামর বিশ্বের তিব্বতী জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষজন। তিব্বতীদের পক্ষ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্ব-নেতাদের এবং বিশ্বের নোবেল শান্তি পুরস্কার-বিজয়ী মানুষদের এবিষয়ে হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত ৯৫ জন তিব্বতী আত্মাহুতি দিয়েছেন। গত ৫ ডিসেম্বর চীনের পক্ষ থেকে এনিয়ে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে বরং কড়া পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয় যে আগুনে আত্মাহুতি বা কোনওভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনবে সরকার।

কলকাতায় 'মুক্ত তিব্বত' দাবির পক্ষে জনৈক ছাত্র তেনজিং লভেন মন্তব্য করেছেন, ''বিশ্বনেতারা অত্যন্ত সরলভাবে আশা করতে পারেন না যে তিব্বতে আত্মাহুতির ঘটনা একেবারে থেমে যাবে।'' তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার, ''তিব্বতী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যতদিন প্রকৃত গুরুত্ব দেবেন না চীনা নেতৃবৃন্দ, ততদিন এই সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত। চীনের এনিয়ে কড়া পদক্ষেপ তিব্বতীদের মোটেও দমাতে পারবে না। বরং ফল হবে বিপরীত। চীনের শাসনের বিরুদ্ধে নাটকীয় অভ্যুত্থান হবে তিব্বতী প্রতিবাদের।

এই প্রতিবাদে তিব্বতী জনগণের সুদৃঢ় মনোভাব ও অহিংস আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটবে।''

বিগত নভেম্বর কিন্তু পূর্ব তিব্বতে গণ-প্রতিরোধ অভ্যুত্থানেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে। গত ২৬ নভেম্বর চাবচা, আমডো (চীনা ভাষায় কুইংঘাই)-তে অন্ততপক্ষে হাজারখানেক তিব্বতী ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্না অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে আত্মাহুতির উস্কানিপূর্ণ লিফলেট বিতরণ করা সত্ত্বেও। বরং পুলিশেরই বিনা-প্ররোচনায় লাঠি চালানোর জন্য কুড়িজন তিব্বতীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এর মধ্যে চারজনের আঘাত গুরুতর।

আন্তর্জাতিক তিব্বত সংস্থার সদস্যরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেতাদের লিখেছেন ২০১২ সালে নোবেল শান্তি পথিকৃৎ হিসেবে তাঁদের ভূমিকা যেন পালন করা হয় যাতে তিব্বতের সংকটময় পরিস্থিতির ওপর আগামী বছরে তাঁরা আলোকপাত করেন। চিঠিতে লেখা হয়েছে, ''শান্তি পথিকৃৎদের অগস্ট সংস্থায় ইউরোপিয় ইউনিয়ন যোগদান করছে। দলাই লামা তাঁর পবিত্রতা নিয়ে এতে থাকছেন। তাঁর পুরস্কার গ্রহণের ২৩ বছর পরেও তাঁর মাতৃভূমির নিরাপত্তা ও শান্তির আলোকে সেই পবিত্রতা আজও উপলব্ধির প্রতীক্ষায়। ১৯৮৯ সালের চেয়েও আজকের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। এমতাবস্থায় সারা বিশ্বের সাড়া পাওয়ার অপেক্ষায় আমরা রয়েছি এবং তাকিয়ে রয়েছি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে।''

কলকাতায় এদিনের সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিল ফ্রি টিবেট কলকাতা নামে একটি সংস্থা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিব্বতীরা স্পষ্ট ও জোরের সঙ্গে দাবি করছে তাদের দেশে স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ফিরিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক দুনিয়া চীনের ওপর চাপ সৃষ্টি করুক।

প্রবীণদের টপকে আই বি প্রধানের পদে সৈয়দ ইব্রাহিম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইনটেলিজেন্স ব্যুরো (আই বি) সহ কেন্দ্রীয় পুলিশ সংগঠনগুলির মুখ্য শূন্য পদগুলিতে নিযুক্তি নিয়ে বিতর্ক তো বটেই, আই পি এস অফিসারদের মধ্যেই ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। চারজন প্রবীণ আই পি এস অফিসারকে ডিঙিয়ে কেন্দ্র সরকার আই বি প্রধানের পদে নিযুক্ত করেছে সৈয়দ আসিফ আলি ইব্রাহিম-কে। উল্লেখ্য, ডাইরেক্টর অফ ইনটেলিজেন্স ব্যুরো-ই শুধু চার-তারা স্তরের মর্যাদা পেয়ে থাকেন। ইব্রাহিম ১৯৭৭ ব্যাচের মধ্যপ্রদেশের আই পি এস ক্যাডার।

তিনি অধিকাংশ সিপিও-র ডাইরেক্টর জেনারেল এবং দিল্লী পুলিশ কমিশনার নীরজ কুমারসহ বেশ কয়েকজন রাজ্য পুলিশ প্রধানের তুলনায় নবীন। আই বি-র ১২৫ বছরের ইতিহাসে এর ডাইরেক্টরের পদে তিনিই প্রথম মুসলিম অফিসার।

আই বি-র সূত্রে খবর, ইব্রাহিমের এই নিযুক্তি

সৈয়দ ইব্রাহিম

নিরাপত্তা সংক্রান্ত এজেন্সিগুলির কাজের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যা সৃষ্টি করবে।

যাঁদের টপকে ইব্রাহিমকে ডাইরেক্টর অফ ইনটেলিজেন্স-এর পদে বসানো হয়েছে তাঁদের অন্যতম হলেন আর এন গুপ্ত (১৯৭৬, হিমাচল প্রদেশ ক্যাডার), ভি রাজাগোপাল (১৯৭৬, ইউনিয়ন টেরিটোরি ক্যাডার) এবং যশোবর্ধন ঝা আজাদ (১৯৭৬, মধ্যপ্রদেশ ক্যাডার)। ২০১৪-র দিকে তাকিয়ে বেছে বেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকেই এইসব উচ্চপদে নিয়োগ করা হচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান।

প্রাপ্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইব্রাহিম না করেছেন কখনও আই বি-র অপারেশন শাখায় কাজ, না সামলেছেন কখনও জম্মু-কাশ্মীর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও নকশাল প্রভাবিত এলাকায় কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তিনি কখনও সাইকোলজিক্যাল অপারেশনে কিংবা সাইবার অপারেশনে সহযোগীও ছিলেন না। বড় জোর তিনি শান্তির সময় জয়পুর বা দিল্লীর মতো শহরে এজেন্সীর দায়িত্ব সামলেছেন। অথচ চারজন সিনিয়র আই পি এস-কে টপকে ইব্রাহিম-কেই নিযুক্ত করা হলো যা এজেন্সির নৈতিক মনোবলকে আঘাত করবে।

বাধা সত্ত্বেও মসজিদ বানাচ্ছে তালিকি জামাত

প্রবল বাধা সত্ত্বেও পূর্ব লন্ডনে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করছে তালিকি জামাত (Tabliqi Zamat)। একসঙ্গে ১০ লাখ লোক নামাজ পড়তে পারবে এমন ভবনসহ লাইব্রেরী, খেলার মাঠ এবং উলেমাদের থাকার ফ্ল্যাটও তৈরি হচ্ছে। মসজিদটি যেখানে নির্মিত হচ্ছে সেটা খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকা। ‘ডেইলি মেল’-এ প্রকাশিত খবর যে— স্থানীয় মানুষরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছে। তাদের নেতা এল এল গর্গ জানিয়েছেন, ‘সন্ত্রাসবাদীদের এত বড়ো একটি নির্মাণ হচ্ছে জেনেও সরকার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। মসজিদটি চরমপন্থী মুসলিম সংগঠনের কার্যকলাপের কেন্দ্র হবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।

মেঘালয়ের রাজধানী শিলং-এ তৈরি হচ্ছে কাচের চারতলা মসজিদ। এটা অসমের মুসলিমদের জন্যও খোলা থাকবে। মুসলিম ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি সঈদ নাগরাম জানিয়েছেন, এক বছরের মধ্যে মসজিদ এবং ঈদগাহটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এতে ব্যয় হবে প্রায় ২ কোটি টাকা। এছাড়াও ইসলামি শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা ও লাইব্রেরীও তৈরি হবে।

ইউরোপে ক্রমশই বাড়ছে মুসলিম জনসংখ্যা

ইউরোপে যে হারে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে শীঘ্রই তারা সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে বলে দাবি করেছে রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক। এর উপর একটি তথ্যচিত্রও তৈরি করে তিনি পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে আসা পাদরীদের এক আলোচনা সভাতে দেখিয়েছেন। বর্তমানে ইউরোপে মুসলিম জনসংখ্যা ১.৭৫ বিলিয়ন অর্থাৎ ইউরোপের মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ। ২০৩০-এর মধ্যে তা দাঁড়াবে ২.৫ বিলিয়ন। ফলে ইউরোপে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং আগামী ৪৫ বছরের মধ্যে ফ্রান্সও ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে তিনি মনে করছেন। ইতিমধ্যেই ইতালির এক মুসলিম নেতা বলেছেন, ‘আমরা একই ঈশ্বরকে অনুসরণ করি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম-বেশিতে তারা উদ্বিগ্ন নন। তবে মুসলিমরা ইসলামের বিস্তার চালিয়ে যাবে।’

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যে কোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন।

— ব্যবস্থাপক

এফ ডি আই নিয়ে মাত্র এক বছরেই সোনিয়া-মনমোহনের মত বদল— বিদেশী অর্থের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না কি?

সংসদে প্রত্যক্ষ বিদেশী অর্থ বিনিয়োগ (এফ ডি আই) বিলটি বিজেপি-র প্রবল বাধা সত্ত্বেও পাশ হয়ে গেছে। ভারতের প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যবসায় বড় বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলির কব্জায় চলে যাওয়াটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। অষ্টাদশ শতকে বৃটিশের মানদণ্ড এইভাবেই ভারতে রাজদণ্ড হয়ে দেশবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। সেদিনও দিল্লীর দুর্বল মুঘল শাসকরা বৃটিশ বণিকদের কাছে ঘুষ নিয়ে দেশকে বেচে দিয়েছিল। তারপর বহু শহীদের রক্তের বিনিময়ে ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়। সেদিনের সেই শৃঙ্খল ছিল রাজনৈতিক পরাধীনতা। একবিংশ শতকে দিল্লীর দুর্বল কংগ্রেস শাসকের দল মার্কিন বণিকদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে দেশকে আর্থিক পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দিল। হ্যাঁ, ঘুষ নিয়েই এফ ডি আই বিলটি সংসদে অনুমোদনের জন্য কংগ্রেস জোট সরকার পেশ করেছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ভারতের বাজারে ঢোকার সুযোগ করে দিতে গত চার বছর ধরে 'লবি' করতে গিয়ে মার্কিন বহুজাতিক বিপণন সংস্থা 'ওয়ালমার্ট' খরচ করেছে মোট ১২৫ কোটি টাকা। ভারতে সুপারমার্কেট খুলতে বিদেশী বিনিয়োগ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওয়ালমার্ট তার ভারতীয় বন্ধু বিপণন সংস্থা ভারতী রিটেল হোল্ডিংসকে মোট ১০ কোটি মার্কিন ডলার দিয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় ৫৫০ কোটি টাকা। অনেকেই জানতে আগ্রহী যে কে এই ভারতী রিটেল সংস্থা। গত ২০০৭ সালে ভারতের খুচরা ব্যবসায়ে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ওয়ালমার্টের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভারতী রিটেল সংস্থা গঠিত হয়। তখন রিটেল ব্যবসায়ে বিদেশী সংস্থার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তাই খুচরা ভোগ্যপণ্য বিপণন কোম্পানি হিসাবে নথিভুক্ত হওয়ার দু'বছরের মধ্যেই ২০০৯ সালে ভারতী নিজেকে 'কনসালটেন্সি' সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করে। কারণ, এই ব্যবসায়ে ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি রয়েছে। এর ঠিক এক বছর পরে ২০১০ সালে ভারতী কনসালটেন্সির মাধ্যমে ১০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে 'ওয়ালমার্ট'। দখল করে নেয় ভারতীর ৪৯ শতাংশ মালিকানা। অথচ ভারতে তখন খুচরা ব্যবসায়ে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। দেশে খুচরোয় এফ ডি আই অনুমোদন আসে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে। ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতাদের

গূঢ়পুরুষের

কলম

দেদার ঘুষ না দিলে এতবড় আর্থিক বেনিয়ম হতে পারে না। দেশের মানুষ জানতে চায় যে ইউপিএ সরকার ২০১১-র আগে খুচরা ব্যবসায়ে বিদেশী বিনিয়োগের বিরোধিতা করেছে, সেই মনমোহন সিং সরকারই চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রস্তাবে অনুমোদন দেয় কীভাবে! মাত্র এক বছরেই সোনিয়া-মনমোহনের মতামত বদলে গেল কেন? এক বছরের মধ্যে আর্থিক সংস্কার নিয়ে ইউপি সরকারের এতটা তড়িঘড়ির পেছনে বিদেশী অর্থের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না কি? দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম বাজার আমাদের ভারতবর্ষ। ভারতে ২০১২ সালে খুচরো ব্যবসায়ের পরিমাণ বছরে ২৭ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২০ সালে খুচরো ব্যবসায়ে পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৪ লক্ষ কোটি টাকা। ভয়াবহ মন্দার কবলে পড়া মার্কিন অর্থনীতিকে ফের চাঙ্গা করতে ভারতের বাজার দখল করাটাই ওবামা প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

১৯৫০-৬০ এর দশকে অনেকটা এইভাবেই দক্ষিণ আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলিকে আর্থিক পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে ছিল মার্কিন প্রশাসন। ইতিহাসের পাতায় যাকে 'ব্যানানা রিপাব্লিক' বলে ব্যাখ্যা করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, এল সালভাদর, নিকারাগুয়ায় উৎকৃষ্ট কলার ব্যাপক ফলন হয়। এই ফলের বাজার একচেটিয়াভাবে দখল নেয় মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা 'ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি'। তারাই চাষিদের আগাম দাদন দিয়ে কলার চাষ করতে বাধ্য করে এবং পরে অতি সস্তা দরে কলা কিনে নিয়ে আমেরিকায় চালান দেয়। অনেকটা এইভাবেই একদা নীলকর সাহেবরা নীলের চাষ করাতো। কলা চাষিদের অবর্ণনীয় দুরবস্থা দেখে চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বাঁধার আগেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ বিশ্বজুড়ে প্রচার করে সালভাদর একজন জঙ্গি কম্যুনিস্ট। আলেন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিপুল অর্থ ঘুষ দেওয়া হয় চিলির সামরিক প্রধান অগস্টো পিনোশেকে। আলেন্দেকে গ্রেফতার ও হত্যা করা হয়। তখন মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন জন এফ কেনেডি। দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রই আজও আমেরিকার তল্পিবাহক। আমেরিকার নির্দেশেই তাদের চলতে হয়। এবার আমেরিকার লক্ষ্য ভারত বা ভারতের বাজার। ওয়ালমার্টের 'লবি' বাবদ ঘুষের টাকা এবং 'ভারতী' গ্রুপের আর্থিক বেনিয়ম নিয়ে সংসদে বিতর্ক হওয়া দরকার। তবে এই প্রয়োজনীয় কাজটি বিরোধী দলের লালু— মুলায়ম-মায়াবতী ত্রয়ী যে করবে না তা হলফ করে বলতে পারি। কারণ, যারা নিজেরাই বিপুল আর্থিক দুর্নীতিতে ফেঁসে আছে তারা দুর্নীতিপরায়ণ কংগ্রেসের সঙ্গেই থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। কথায় আছে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে সংঘর্ষের আশঙ্কা

নিশাকর সোম

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে টার্গেট করে এ রাজ্যের সব রাজনৈতিক দলই প্রাক্-প্রস্তুতি করেছে। এই ব্যাপারে সব থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে বিজেপি। এই অবস্থানকে সহায়তা করেছে পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক এক বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় বুদ্ধদেববাবু একদিকে ইমামভাতা, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন, বর্তমান রাজ্য-সরকারই সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দিচ্ছেন। অপরদিকে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর পরিচালিত পূর্বতন সরকার মুসলিমদের সম্পর্কে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল, বর্তমান সরকার কার্যত তা প্রয়োগ করছে না। উল্লেখ্য একসময়ে এ-রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ বুদ্ধবাবুকে ‘‘পশ্চিমবঙ্গের বাল্‌ঠাক্‌রে’’ বলে অভিহিত করতেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। তাই রাজ্য সিপিএম সম্পাদক বিমান বসু বামঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন এবং জেলা কমিটিগুলিকে ‘মনগড়া’ রিপোর্ট দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বস্তুত গ্রামে-গঞ্জে এখন সিপিএমের নির্বাচনী লড়াই করার অবস্থা নেই।

এই কারণেই শহরে শহরে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে গ্রামের লোকেদের মনে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করতে চায় যে সিপিএম শহরে আছে। রাজ্যের প্রাক্তন ভূমিরাজস্বমন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা, যিনি হজ করে হাজি হয়ে বলেছেন যে মার্কসবাদের থেকে কোরানের বয়েত অনেক উপকারী। মোল্লা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে তাঁর এলাকায় ‘‘মার কা বদলা মার’’ নীতি চালানো হবে। ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এরই বিপরীতে তৃণমূলনেত্রীর বারবার শাসানি সত্ত্বেও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বহীন এমন একটিও অঞ্চল পাওয়া যাবে কি?

এরই মধ্যে সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মাস্টারমশাই)-কে শিক্ষা-কৃষি থেকে সরিয়ে

দেওয়া হয়েছে। তাঁকে সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না। এমনকী বিধানসভা অধিবেশনের নোটিসও তাঁকে দেওয়া হচ্ছে না। সিঙ্গুরের পঞ্চায়েতের কাজকর্ম থেকে রবীনবাবুর লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে বেচারাম মান্নার লোকজনকে বসানো হয়েছে। খবরে প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে বেসরকারি বীজ সরবরাহকারীদের ‘অশুভ আঁতাত’ উদ্ঘাটনের জন্য সি আই ডি-কে তদন্তের আদেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কড়া নোট দেন। এরপর থেকে রোটাণ্ডায় হওয়া সরকারি আমলাদের কোনও বৈঠক-সম্পর্কে রিপোর্ট রবীনবাবুকে দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। ঠিক এই সময়েই রবীনবাবুর বিরুদ্ধে একটি ‘গুরুতর অভিযোগ’ আনা হলো— কৃষিমন্ত্রীর সই জাল করে দলীয় তহবিল সংগ্রহের একটি আবেদন-এর কপি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে সেটা সুব্রত বক্সি-কে গুরুতর বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করার দায়িত্ব দেন।

এইভাবেই সিঙ্গুর আন্দোলনের মূল স্থপতিকে একেবারে কোণঠাসা করে দেওয়া হলো। এর প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন কি পঞ্চায়েত নির্বাচনে পড়বে না?

এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলের নেতা শোভনদেব-কে তৃণমূলের কর্মীদের নিগ্রহ সম্পর্কে আচার্য তথা রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন উপাচার্যকে ডেকে তাঁর উদ্বেগ জানিয়েছেন। শোভনদেববাবুর সামনে পথ হলো— তাঁর নিজস্ব গোষ্ঠী (?) নিয়ে মমতা পার্থদের বিরুদ্ধে লড়ে হেস্তনেস্ত করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন তৃণমূলের একাধিক বিধায়ক এবং সাংসদ মমতা-সুব্রত মুখার্জি-পার্থ চ্যাটার্জিদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। কাজেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী দলগুলিকে দাঁড়াতে দেওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা হবেই।

মমতার একান্ত বিশ্বস্ত সাংসদ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সুপ্রিমকোর্টে রাজ্য সরকারের মামলা পরিচালনা করার ব্যাপারে জড়িত আছেন, তাঁর সঙ্গে কালীঘাটের গর্ভগৃহে সাধারণের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। জানা যায় কালীঘাটের গর্ভগৃহে প্রবেশ এবং নানা ব্যাপারে কল্যাণবাবুর কন্যা নাকি অপমানিত হন। ঠিক এর পরেই কালীঘাট মন্দিরের গর্ভগৃহের মামলায় দায়িত্ব-প্রাপ্ত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা কবীর বসুকে দেওয়া হয়। হাইকোর্ট থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করানো হয়। মমতা-এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাটি প্রত্যাহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনজীবী অভিজিত সেনগুপ্তকে দায়িত্ব দেন। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়। এরই প্রতিশোধে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজিৎ সেনগুপ্তকে সরিয়ে বামফ্রন্টের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী রবীন্দ্রলাল মৈত্রের ঘনিষ্ঠ অভিজিত ভট্টাচার্যকে নিয়োগ করেন।

গণতন্ত্রে হাতির হানা, দোসর সাইকেল

পরম প্রিয়
ডেমোক্রেসি অব ইন্ডিয়া

তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক গর্ব। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে তোমার আত্মশ্লাঘাও কম নয়। কিন্তু এবার বড় মায়া হলো তোমায় দেখে। কৌশল নামক নীতির কাছে গণতন্ত্র নামক নীতির হার দেখতে মোটেও ভালো লাগল না। তোমার মন্দির সংসদে টাকা দিয়ে ভোট বেচাকেনা দেখে গা গুলিয়ে উঠেছিল, লজ্জায় মাথা নুয়ে গেছিল। এবার সেটা ফের হলো। বহুজন সমাজপার্টির মত্ত হাতি যেন তছনছ করে দিলে সংসদের গরিমা। মুলায়মের সাইকেল যেন ফিচেল হাসল গণতন্ত্রকে ভূপাতিত করতে পেরে।

একদিন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি ভারতবাসীকে একটা মহা সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ১৩ দিন পর ক্ষমতা থেকে চলে যেতে হলেও সরাসরি টিভিতে সংসদের অধিবেশন দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ৫ আর ৭ ডিসেম্বর লোকসভা আর রাজ্যসভার ছবি দেখার পর মনে হলো ভাল করেননি বাজপেয়িজি। ওটা দেখতে না পেলেই ভালো হোত। খবরটা জানাই যেত। কিন্তু কানে শুনে, চোখে দেখে যেন বড্ড লজ্জা লাগল।

এফ ডি আই ভালো না মন্দ তা বলবে সময়। কিন্তু যেভাবে এফ ডি আই-কে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে চাতুরিতে জয়ী হলো তা দেখে লজ্জা হলো। আমাদের লজ্জা হলো। ভারি লজ্জা হলো। সংসদের ভিতরে কিংবা বাইরে রাস্তায় নেমে এফ ডি আই-এর বিরোধিতা করলেও মায়াবতী, মুলায়মের দল সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে কেমন জিতিয়ে দিল মনমোহন সরকারের এফ ডি আই নীতিকে। সপা, বসপা লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করায় ম্যাজিক ফিগার ছিল ২৫১। বিজেপি-র আনা প্রস্তাব পেল ২১৮টি ভোট। আর ২৫৩টি ভোট পেয়েই সরকার পক্ষ জিতে গেল। সংখ্যাতত্ব বলছে, লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাপকাঠি ২৭২। সেখানে মাত্র ২৫৩টি ভোট পেয়েই গণতান্ত্রিক জয়ের মর্যাদা পেয়ে গেল এফ ডি আই। যেসব দল সংসদে এফ ডি আই বিরোধিতায় সরব হয়েছেন তাদের সাংসদ সংখ্যা ২৮২। অন্যদিকের সংখ্যাটা ২২৪।

সত্য গণতন্ত্র, বড় বিচিত্র এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

বিজেপির আনা এফ ডি আই বাতিলের প্রস্তাবের পক্ষে প্রথম থেকেই ছিল এন ডি এ এবং বামদলগুলি ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসসহ ২৪০টি ভোট। অপরদিকে ডি এম কে সরকারকে সমর্থন দেওয়ার কথা আগাম জানানোয় ইউপিএ-২ এর পক্ষে ছিল ২৬১টি ভোট। ধোঁয়াশা ছিল মুলায়ম সিং যাদবের দল সমাজবাদী পার্টির ২২টি এবং মায়াবতীর বি এস পি-র ২১টি ভোট। ভোটাভুটির ঠিক আগে এই ৪৩ জন সাংসদের দুই দল এক যোগে লোকসভা থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এফ ডি আই নীতির পাশা মার্ক মেলা এক রকম নিশ্চিত হয়ে যায়।

ভোটাভুটির আগের দিন এফ ডি আই প্রসঙ্গে মুলায়ম সিং সংসদে যখন বলছিলেন তখন মনে হচ্ছিল তিনিই দেশের সব থেকে বড় বিরোধী। সোনিয়া গান্ধীকে বলেছিলেন, আপনার নামের সঙ্গে গান্ধীর নাম জড়িয়ে আছে তাই এফ ডি আই এনে দেশের সর্বনাশ করবেন না। বলেছিলেন, গান্ধীজী বেঁচে থাকলে এমনভাবে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি আসতে পারত না। আর পরদিনই কংগ্রেসের এফ ডি আই নীতিকে বাঁচাতে মুলায়ম সিং-রা ওয়াকআউট করে ফেললেন। দোসর বহেনজির দল। এরপর সুষমা স্বরাজ ভুল ব্যঙ্গ করেননি। বলেছেন, মুলায়মজি বলেছিলেন গান্ধীজী থাকলে এফ ডি আই রোখা যেত কিন্তু মুলায়ম সিং যাদব থাকলেও এফ ডি আই-কে রোখা যেত।

কিন্তু কী আর করবেন মুলায়ম সিং যাদব। এফ ডি আই ভয় তো কৃষকের, ছোট ব্যবসায়ীর। কিন্তু তার কাছে তো অনেক বড় ভয় সি বি আই। আসলে সেই সি বি আই ভয়ের কাছেই তো হার মানল এফ ডি আই বিরোধিতা। প্রিয় গণতন্ত্র মন খারাপ না করে একটু হিসেব করে দেখ, কংগ্রেসের পাশে যারা আছে তারা সবাই সি বি আইয়ের ফাঁদেও আছে।

ভোটাভুটিও লোকসভারই পুনরাবৃত্তি দেখল রাজ্যসভা। মায়াবতীর কাঁধে ভর দিয়ে খুচরো বৈতরণী নিশ্চিন্তে পার হয়ে গেল কংগ্রেস। সরকার পেল ১২৩টি ভোট, বিরোধীদের ঝুলিতে পড়ল ১০৯টি। সব মিলিয়ে এফ ডি আই-এর পক্ষে সংসদের ছাড়পত্র পেয়ে গেল ইউপিএ-২ সরকার। গণতান্ত্রিকভাবে!

রাজ্যসভায় চিত্রনাট্য তৈরি ছিল, মঞ্চ ছিল প্রস্তুত। ভোটাভুটির পালাটাও অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন কংগ্রেসের ফ্লোর ম্যানেজাররা। আর এ ক্ষেত্রে তাঁদের সহায় হয়ে দাঁড়ালেন বরাবরের বন্ধু মুলায়ম-মায়াবতী। লোকসভায় এই দুটি দলকে ওয়াকআউট করলেই চলেছে, কিন্তু রাজ্যসভায় ইউপিএ-র সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাই দুটি দলের মধ্যে অন্তত একটির ভোট নিশ্চিত করা কংগ্রেসের পক্ষে খুবই জরুরি ছিল। বিশেষ করে মায়াবতীর দলের সাংসদ সংখ্যা বেশি থাকায় তাঁকে রাজি করানোটা ছিল আরও জরুরি। কারণ রাজ্যসভায় মুলায়মের সাংসদ সংখ্যা ন'জন, যেখানে মায়াবতীর পনেরো। ঠিক করা চিত্রনাট্যেই অভিনয় সারলেন উত্তরপ্রদেশের দুই ঝানু রাজনীতিক। ব্যাস, তাতেই জয় পাকা কংগ্রেসের।

এক আশ্চর্য ভোট কেনাবেচার খেলা দেখল সংসদ। এ যেন সেই দেখছি চোর চুরি করছে, কিন্তু ঘুম থেকে ওঠা যাচ্ছে না। বড্ড শীত। কাল সকালে রোদ উঠলে তখন বরং চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করা যাবে খন।

— সুন্দর মৌলিক

চীনের নতুন সরকার কি আরও আগ্রাসী হতে চলেছে?

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবসর প্রাপ্ত)

চীন সাম্রাজ্য শাসিত হয় সামরিক কায়দায়। সেখানে কারও কোনও প্রশ্ন করার ভাষা নেই, প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। একমাত্র শাসক দলের নেতৃত্ব যে আদেশ এবং নির্দেশ দেবেন তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে। এটাই নিয়ম। মানবাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মের দোহাই অথবা নিরপেক্ষতা এসবের কোনও মূল্য নেই। ব্যক্তিগত লাভ, লোভের কোনও জায়গা নেই। রাষ্ট্রের কল্যাণে সরকারি নির্দেশই শেষ কথা। প্রতি দশ বছর পর কম্যুনিস্ট পার্টির শাসকদের চয়ন হয়। সব সময় যে সহজ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে, তা নয়। কিন্তু ২০১২ খৃস্টাব্দের ক্ষমতা হস্তান্তর নজিরবিহীন শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি এবং রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হু-জিনতাও যিনি বিগত দশ বছর ক্ষমতায়

চীনের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং

চীনের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং

থেকে চীনকে বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়েও চীনকে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি ক্ষমতা থেকে সরে গিয়েছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জি-জিনপিং। সেই সঙ্গে তিনি শক্তিশালী চীনা মিলিটারী কমিশনের চেয়ারম্যানের পদও গ্রহণ করেছেন। হু-জিনটাও ওই পদ থেকেও সরে গিয়েছেন, অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এখন জি জিনপিং। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী, অর্থাৎ পূর্ববর্তী পার্টি প্রধানরা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও প্রায় বছর দুয়েক মিলিটারী কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ ধরে রাখতেন। এ বছর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সেই একই সঙ্গে চীনা পলিটব্যুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটির কলেবরও একটু ছোটো হয়েছে। যে কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই কমিটির সদস্য সংখ্যা নয় থেকে কমিয়ে সাত করা হয়েছে। অর্থাৎ জিনপিং-এর পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সামান্য হলেও সহজ হয়ে গেল। আগামী বছর মার্চ মাসে জি-জিনপিং আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। যাঁরা এ বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা মনে করেন, এটা ভেবে নেওয়া সঠিক নাও হতে পারে, যাঁরা ক্ষমতায় এলেন তাঁরা সকলেই অভূত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অথবা জি-জিনপিং এর একনিষ্ঠ সমর্থক। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রেই দেখা যায়, বহু নেতা ক্ষমতার অলিন্দে উঠে আসেন বিভিন্ন ভাবে প্রভাব খাটিয়ে। অনেকে আবার বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্যও ক্ষমতায় আসেন। দায়িত্ব নিতে অপারগ কিন্তু পিছনে থেকে ক্ষমতা ভোগ করতেই যাঁরা বেশি আগ্রহী। চীন রাষ্ট্রের এই নতুন দল কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন সেটা দু-তিন বছরের মধ্যেই বোঝা যাবে।

জিনপিং অবশ্য দ্ব্যর্থ ভাষায় ঘোষণা করেছেন, তাঁর মন্ত্রিসভা সাধারণ মানুষের কল্যাণ এবং জীবনমানের উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার দেবেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, বেকার সমস্যার সমাধান এবং পরিবেশ রক্ষা তাঁর সরকারের প্রধান এবং প্রাথমিক লক্ষ্য থাকবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চীন বর্তমানে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে। প্রথমত, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার বিশেষ প্রভাব চীনের অর্থনীতিতে পড়েছে। উন্নয়নের হার নিম্নমুখী। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে অবস্থা বেশ সঙ্গীন। কারণ অনেক ব্যাঙ্কই সঙ্কটে পড়েছে। অনেকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মতোই তাদেরও অবস্থা। জিনপিং মন্ত্রিসভা কিভাবে এই অবস্থার মোকাবিলা করে তার দিকে সমস্ত বিশ্ব তাকিয়ে থাকবে। অনেক বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন, ওয়েন জিয়াবাও তাঁর বিদায়ী ভাষণে মন্তব্য করেছেন, যেভাবে চীনে ভ্রষ্টাচার (গ্রাফট) মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তার দমন করতে না পারলে ভবিষ্যতে দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে। সেই জন্যই হয়তো কমরেড ওয়াং কুইমান যিনি শিল্পপতি এবং সফল ব্যবসায়ী হিসাবে বিশেষ ভাবে পরিচিত তাঁকে শিল্প অথবা উদ্যোগের দায়িত্ব না দিয়ে 'ভ্রষ্টাচার দূরীকরণ' দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র চীনের নতুন সরকারের বিদেশ নীতি, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে কি নীতি গ্রহণ করবে তার কোনও উল্লেখ অথবা আভাস পাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল, তার কোনও হদিস পাননি। ভারতবর্ষ বিশেষভাবে শোনার জন্য আগ্রহী ছিল চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সমাধানে চীনের নতুন সরকার কোনও ভরসার বাণী দেন কিনা। তিব্বতের মানুষ প্রতীক্ষা করছিলেন, চীনের তিব্বত নীতির কোনও পরিবর্তন আশা করা সঙ্গত হবে কিনা। দক্ষিণ চীন সমুদ্র তটবর্তী ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিও অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল, ওই অঞ্চল নিয়ে নতুন চীন সরকারের কোনও ভাবনা চিন্তার আভাস পাওয়া যায় কিনা। কমরেড লি কেকিয়াং চীনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। কিন্তু সকলেই মনে করছেন, ওয়েন জিয়াবাও যে নীতি গ্রহণ করে চীনকে বিগত একদশক ধরে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই নীতির কোনও আশু পরিবর্তন হবে না। অবশ্য ক্ষমতা গ্রহণের আগেই এইসব বিষয়ের উপর নতুন সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করার আশাও সমীচীন নয়। বরং ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ই চীন সরকার সামরিক বাহিনীর, বিশেষ করে বিমান বাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডারের এক বিশাল প্রদর্শনী করে চীনের নাগরিক তথা বিশ্ববাসীকে

উত্তর সম্পাদকীয়

এক বার্তা দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে চীন অভূতপূর্ণ উন্নতি করেছে। স্বল্প দূরত্বের ক্ষেপণাস্ত্র থেকে বিশ্বের যে কোনও স্থানে আঘাত করার মতো ক্ষেপণাস্ত্র তার অস্ত্রভাণ্ডারে রয়েছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র এতই শক্তিশালী যে বিশ্বের কোনও জ্যামিং ব্যবস্থা তাকে গতিপথ থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হবে না। যে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে তাকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার ক্ষমতা সে রাখে। দ্বিতীয়ত, চীন তার নিজস্ব বিমানবাহী জাহাজ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই কৃতিত্ব যেমন বিদায়ী সরকারের প্রাপ্য, তেমনি নতুন সরকারকেও সাহস যোগাবে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কারও সঙ্গে সমঝোতা করার কোনও প্রয়োজন চীন সরকারের নেই।

এই ক্ষমতার দম্ভের লক্ষণ অচিরেই দেখা গেল। হাইনান প্রদেশের পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও জলযান চীনের দাবী করা দক্ষিণ চীন সমুদ্র এবং সেই অঞ্চলের দ্বীপগুলির নিকট দেখা যায় তাহলে তারা সেই জলযানকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে, প্রয়োজনে জাহাজে উঠে অনুসন্ধান, নাবিকদের জিজ্ঞাসাবাদ, গ্রেপ্তার পর্যন্ত করতে পারবে। ওই দ্বীপগুলির নিকটে নোঙ্গরফেলা, কোনও কিছু নির্মাণ অথবা ভাঙ্গা (উপকূল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা) যেমন অবৈধ হবে, তেমনি চীনা রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার প্রতিকূল কোনও প্রচারও করতে দেওয়া হবে না। ভিয়েতনাম ভারতকে যে অঞ্চলে সমুদ্র থেকে খনিজ তেল আহরণের বরাত দিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত যেখানে কোনও কূপ খননের কাজও শুরু হয়নি, সেই অঞ্চলও হাইনান প্রদেশের দায়িত্ব প্রাপ্ত এলাকার মধ্যেই পড়ে।

নতুন চীন সরকারের এই সর্বশেষ নির্দেশিকা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে নতুন করে সংঘাত ও সমস্যার সৃষ্টি করল। চীনের পাসপোর্টে ভারতের ভূখণ্ডে তাদের দাবী করা অঞ্চল বিন্দুরেখা দিয়েও দেখানো হয়েছে। আগেই অরুণাচল ও কাশ্মীরের নাগরিকদের তারা সাধারণ ভিসা না দিয়ে আলাদা কাগজ জুড়ে দিত। বোঝা যাচ্ছে, হু-জিনতাও এবং ওয়েন জিয়াবাও-এর নীতি চীনের জি-জিনপিং ও লি-কেকিয়াং এর নূতন সরকার না মানতেও পারেন। পরিবর্তে আরও অনড় অবস্থান তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন। ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা চীনের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্য চীনে পাড়ি দিয়েছেন যদিও চীনের সরকারি ক্ষমতার প্রধান জি-জিনপিং অথবা প্রধানমন্ত্রী লি-কেকিয়াং তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারও দেননি। সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত উভয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদ্বয় সমীক্ষা করে জানিয়েছেন এত বছরের আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে। তাঁরা এখন দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার (প্রয়োগগত) দিকে এগোবেন। এডমিরাল যোশীর সাম্প্রতিক বার্তা চীন সরকার সুনজরে দেখেননি, তারও ইঙ্গিত দিয়ে দেন শিবশঙ্কর মেনন। ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ঢিলেমি এবং গড়িমসি কোনও নূতন অধ্যায় নয়, আশা করব দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এবার নড়েচড়ে বসবেন।

‘ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি’

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস জে কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

জাতীয় সুরক্ষা ও চীনের আগ্রাসী মনোভাব

তরুণ শাণ্ডিল্য

কারাকোরাম থেকে অরুণাচলপ্রদেশ হয়ে মায়ানমারের উত্তরাংশ সর্বত্রই চীনের দাবি— ভূখণ্ড দখল চাই। তাজাকস্তান, কিরঘিজিয়া এবং কাজাকস্তানেরও কিছু কিছু চীনের চাই। চীনের দাবি এ সমস্ত অঞ্চল তিয়েনমানয়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম শতাব্দীর সিল্ক রুটের মানচিত্র তারা বারবার সামনে নিয়ে আসছে। ভারতের লাদাকের কিছু অংশও তারা দাবী করে বসে আছে। আকসাই চীন তো যথারীতি চীনের দখলে। এর মধ্যে চীনের বড়ো সুযোগ এসেছে

পাকিস্তান দখলীকৃত ছয়শো বর্গ কিলোমিটারের জমি প্রাপ্তি। এই জায়গা দিয়ে চীনের অর্থ এবং কারিগরি সাহায্যে তৈরি হয়েছে কারাকোরাম ফ্রেন্ডশিপ হাইওয়ে। ইসলামাবাদ থেকে মোটর গাড়ী চড়ে সোজা বেজিংয়ে যাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিংঙ্গারও এই হাইওয়েটি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কেন ব্যবহার করেছেন তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। ঠিক একইভাবে জানা যায়নি পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) রাজধানী ঢাকা থেকে কিসিংঙ্গারের বিমান স্বদেশে ফেরার আগে বেজিংয়ে কেন অবতরণ করতো। ঢাকার বিবিসি প্রতিনিধি মার্ক টুলিও এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি। ঘটনাগুলি বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের আগের ইতিহাস।

চীন অরুণাচল প্রদেশের ৫৪০০০ বর্গ কিলোমিটার দাবি করে বসে আছে। এমন কি আসামের বমডিলাও তাদের চাই। মায়ানমারের উত্তরাংশের কিছু কিছু জায়গার উপরও চীনের শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ। শুধু তাই নয়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে পঙ্গু করার পরিকল্পনা নিয়ে অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে চীন ব্রহ্মপুত্রের উপর বাঁধ নির্মাণ করে চলেছে। এই নদীর জল চীন তাদের দেশের কৃষির উন্নতির জন্য খাল কেটে নিয়ে যাবে। এতে আমাদের কৃষি এবং চা শিল্প যেমন ধ্বংস হবে তেমনি বনভূমিও এগিয়ে যাবে বিলুপ্তির পথে।

স্থল ছেড়ে এবার তলিয়ে দেখা যাক চীনের দরিয়া নীতি। বিশেষ করে ভারতকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কলম্বো বন্দরকে আধুনিকীকরণের প্রস্তাব দিয়ে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে। পাকিস্তানের করাচি বন্দরেও একই কায়দায় ঘাঁটি শক্ত করেছে। উদ্দেশ্য ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তার। অছিলা, এই অঞ্চল থেকেও এন জি সি খনিজ তেল উত্তোলন করতে পারবে না।

এবার চীনের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে দক্ষিণ চীন সাগরের বিরোধপূর্ণ দ্বীপগুলির উপর। চীন বহুদিন আগে থেকেই বিতর্কিত প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জকে নিজেদের দখলে নেওয়ার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকার নিয়ে প্রতিবেশী দেশ তাইওয়ান, ভিয়েতনাম এবং ফিলিপিনসের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এমনকি চীনের এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে কেন্দ্র করে জাপানের সঙ্গেও মতবিরোধ দেখা গেছে। কিছুদিন আগেই দরিয়ার অধিকার কায়েম করার উদ্দেশ্যে চীন বিমানবাহী রণতরীও সাগরে ভাসিয়েছে। এই রণতরীটি কেনা হয়েছে ইউক্রেন থেকে। যদিও কোনও একটি কোম্পানী এই রণতরীটি কিনেছিল ভাসমান ক্যাসিনো তৈরি করার জন্য। পরে চীনের নৌ-বাহিনী কর্তৃপক্ষ সেটি কিনে নেয় এবং মেরামত করে বিমানবাহী রণতরীর রূপ দেয়। আসলে সবটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করা। চৈনিক কূটনীতি।

চীন প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ রক্ষা করার জন্য সেনা মোতায়েন করতে চলেছে। সেনা ঘাঁটিটি হবে প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জের উডিল্যান্ডের শানসা শহরে। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে যে পরিকল্পনাটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করেছে। প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে চীন এবং ভিয়েতনামের অধিকার বিরোধ থাকা সত্ত্বেও গত জুন মাসে চীন উডিল্যান্ডের শাসনা শহরটিকে গড়ে তুলেছে সমগ্র এলাকাটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। দক্ষিণ চীন সাগরের এই নবগঠিত শানসা শহরটিকে চীন কর্তৃপক্ষ প্রদেশের মর্যাদা দিয়েছে এবং একটি আইনসভাও গঠিত হয়েছে। গত ২২ জুলাই এই আইনসভার ৪৫ জন সদস্যের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। বিতর্কিত দ্বীপগুলির মালিকানা নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও চীন এই পদক্ষেপ নিয়েছে, যা এতদ্‌অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে ১৯৭৪ সালের একটি যুদ্ধে ভিয়েতনামকে পরাজিত করে চীন উডি দ্বীপ দখল করে। তাইওয়ানও এই দ্বীপ নিজেদের বলে দাবি করে। শানসা

শহর গড়ে তুলে সেটিকে প্রদেশের মর্যাদা দিয়ে এবং আইনসভা গঠন করে চীন পার্শ্ববর্তী স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জ এবং স্কারবরাহ শোয়াল সহ পুরো দক্ষিণ চীন সাগরের উপর তার খবরদারি কায়েম করতে চাইছে।

দক্ষিণ চীন সাগরের এই দ্বীপগুলিতে মাত্র কয়েক হাজার মৎস্যজীবী বসবাস করে। তবে প্রাকৃতিক সম্পদে এই দ্বীপগুলি ভারতের অরুণাচল প্রদেশের মতোই সমৃদ্ধ। সমুদ্রের তলদেশ থেকে যথেষ্ট খনিজ তেলও উত্তোলন করা যাবে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চীন এবং ফিলিপিনসের মধ্যে সংঘাত হয়েছে। কিন্তু চীন তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে অটল। ভিয়েতনাম ওই অঞ্চলে চীনের তেল অনুসন্ধান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি যেমনই হোক না কেন, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা চীন তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মনোভাবকে এভাবেই জিইয়ে রাখবে এবং ক্রমাগত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তার প্রভাব বাড়াতে থাকবে।

এতে এসিয়ান সংগঠনের সদস্য দেশগুলি উদ্বিগ্ন। প্যারাসেল দ্বীপে চীনের সেনাবাহিনী পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিবেশী দেশগুলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। চীনের এই দ্বীপ-ক্ষুধা এবং দরিয়া দখল ভারতের জন্যও চিন্তার বিষয়। মূল কারণ, অবশ্যই দরিয়া। এবার হয়তো ভারত মহাসাগরেও চীনের রণতরী ভাসবে দরিয়া দখলের চেষ্টায়।

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155
CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

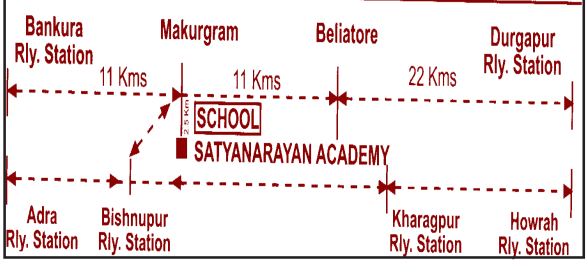

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ থেকে আমরা কিছু শিখিনি

নীতিন রায়॥ এ বছরের ২৬ জুলাই লস্কর-ই-তৈবা এবং ২৬/১১-র ঘটনার মূল মাথা আবু জিনদাল ধরা পড়েছে, তাকে জেরা করে অনেক কিছু সামনে এসেছে। সে জানিয়েছে তার সংগঠন নতুন করে ভারতে আক্রমণ শানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। জাকিউর রহমান লাকভি রাওয়ালপিন্ডিতে জেল খাটছে। আদিয়ার জেলে আছে। ইউসুফ মুজাম্মিল লস্কর-ই-তৈবার দায়িত্ব নিয়েছে। মুজাম্মিল ২০০৬ সালে ট্রেনে বিস্ফোরণের পিছনে ছিল। ওই বিস্ফোরণে মারা গেছে ২০০ জন যাত্রী। এসব তথ্য জানা গেলেও ভয়ের কারণ অন্য। কেননা কোথা থেকে কোনও পদ্ধতিতে, কোথায় আক্রমণ হবে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে তার তথ্য নেই।

ভারতের অর্থনীতি দ্রুতহারে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোয়েন্দা সংস্থা সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে পারছে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল সিন্ধে ভুল ধারণা নিয়ে চলেছেন। সুশীল সিন্ধে জানিয়েছেন, ‘‘আমরা ২৬/১১-এর মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে পেরেছি। আরও বড় ঘটনা আমরা আটকাতে পেরেছি। আমরা আরও সতর্ক হয়েছি, গোয়েন্দা তথ্য ও নিরাপত্তার খাতিরে।’’

কিন্তু প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং অন্যরকম ধারণা পোষণ করেন। তিনি পার্লামেন্টে জানান, পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের ৪২টি ক্যাম্প রয়েছে। আমরা সুপরিকল্পিত সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অক্ষম। অনুমান করা হচ্ছে, পাকিস্তানে ৭৫০ জন সন্ত্রাসী ক্যাম্পে রয়েছে। পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের অপেক্ষায় রয়েছে।

লাঠির চেয়ে কাঠি বড়

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে নাকি ঢেলে সাজানো হয়েছে বলে দাবি করছে সরকার।

ভারতীয় সংসদ ভবনে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। (ফাইলচিত্র)

কিন্তু ২৬/১১-এর ব্যর্থতা কি প্রমাণ করে? গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পাকিস্তানে কি ঘটছে সে কথা দূরে থাক, ভারতে নাকের উপর ঘটানোর খবর নেই তাদের কাছে। দিল্লী পুলিশের বিব্রত হবার মতো খবর রয়েছে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন ইয়াসিন ভটকল পশ্চিম দিল্লীর শহরতলিতে বাস করতো। তাও আবার ছেলেমেয়ে ও বউ নিয়ে। দিল্লী পুনে ও বাঙ্গালোরে সন্ত্রাসী আক্রমণের ছক কষে ছিল ইয়াসিন ভটকল। সে করাচী প্রজেক্টে অংশগ্রহণকারী একজন ভারতীয় মুজাহিদিন। ওই প্রজেক্টে ভারতীয় নগরগুলোতে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই সমস্ত কথা মনে রেখে সরকার ১৫০০০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। দুর্মূল্য ট্যাক্সের এই টাকা ৭টি গোয়েন্দা সংস্থার খাতে ব্যয় হয়। সংস্থাগুলি হচ্ছে— (১) রিসার্চ এন্ড অ্যানলিসিস উইং, (২) ন্যাশন্যাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অরগানাইজেশন, (৩) ডিফেন্স ইনটেলিজেন্স এজেন্সি, (৪) মিলিটারি ইনটেলিজেন্স, (৫) ডাইরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স, (৬) কেন্দ্রিয় ইকনোমিক ইনটেলিজেন্স ব্যুরো।

কেউ জানে না এমনকি পার্লামেন্টও জানে না কি করে এই বিশাল অর্থ খরচ হলো। ডিপার্টমেন্ট অফ হোম ল্যান্ড এন্ড সিকিউরিটি জানিয়েছে যে সমস্ত তথ্যই ‘‘Bunch of Crap’’। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ অফিসার জানালেন, ‘গোয়েন্দা দপ্তরের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে ইনটেলিজেন্সের অভাব।’ গোয়েন্দা সংস্থা টেলিফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক তথ্য জানতে পারে। কিন্তু এটি আজকাল নির্ভরযোগ্য মাধ্যম নয়। পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা আরও ধূর্ত হয়েছে। তারা টেলিফোন এবং ই মেল গোপন রেখে চলেছে। অনেক সময় গোয়েন্দা সংস্থা অনেক বাক্যালাপে ‘ইন্টারাআপ্ট’ করতে পেরেছে। কিন্তু ‘ডি-কোড’ করতে পারেনি। হতাশাজনক বিষয় এই যে সন্ত্রাসীরা কি কথা বলছে আমরা তা জানতে পারছি না।

হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের বড় অভাব। দেখে বা মাটিতে কান দিয়ে শোনা ও তথ্য সংগ্রহ করার মতো মানবসম্পদ হাতে নেই। মানবশক্তি দ্বারা (সোর্স) সংগৃহীত তথ্যই মূল্যবান ও কার্যকর।

প্রতিদিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এক সঙ্গে দুপুরবেলায় বসে মাল্টি এজেন্সি সেন্টারে আজ পর্যন্ত প্রায় ১০০০টি মিটিং করেছে, কিন্তু এই মিটিং-এর ফলাফলের দিকে নজর দিলে আঁতকে উঠতে হয়। কোনও তথ্যই সন্ত্রাসী আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি। পি চিদাম্বরম ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি এম এ সি-এর প্রতিষ্ঠা করেন। মজার কথা হলো— এই মিটিং-এ একটি ‘বুকলেট’ দেওয়া হয় যাতে সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্যগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ (ইনকনসিস্‌টেন্স) এবং অকার্যকরভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিজেদের সোর্স জানাতে চায় না। আবার যথাকালে নিজেদের ক্রেডিট নেবার জন্য তথ্য গোপন করে। আই বি অফিসিয়াল বলেছে, গুগল ক্র্যাস করে গেলে ‘র’-এর তথ্য লোপাট হয়ে যাবে। আবার ‘র’-অফিসারদের অভিযোগ— আই বি এ-এর রয়েছে ‘পুলিশ মাইন্ডসেট’।

‘‘সোস্যাল মিডিয়া’’ প্রায় লক্ষ্যই করা হয়

না। প্রায় হাতের বাইরে। এ বৎসরের ১১ আগস্ট মুম্বাইয়ের দাঙ্গা সোস্যাল মিডিয়া-র কারণে হয়েছে। প্রায় ৫০ জন পুলিশ আহত হয় এবং ২ জন নিহত হয়।

সাম্প্রতিককালের এম এ সি-এর বৈঠক বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বি এস এফ)-এর এক অফিসার বলেন, ‘‘পাকিস্তানের টুইটার সীমান্ত অঞ্চলে সমস্যা তৈরি করছে।’’ কিন্তু একথা অনেকেই বুঝতে পারেননি, যদিও প্রত্যেকেই জয়েন্ট সেক্রেটারি স্তরের অফিসার।

সন্ত্রাসের আক্রমণ

১ থেকে ১৪ নভেম্বরের মধ্যে সন্ত্রাসী আক্রমণ হতে পারে। তাই সতর্কতা জারি হয়। দুটোই ফলস অ্যালার্ম। আই বি অফিসাররা বলেন, আমরাও রিয়েল থ্রেট ও ফলস ইকোর মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারিনি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফলস ক্লু ও রিয়েল থ্রেটে সমানভাবে সাড়া দেবে।

তথ্য যোগাড় করাটাই সমাধান নয়। সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করার কোনও সার্বিক নীতি নেই। ইনটেলিজেন্স তথ্য যোগাড় করার নামে স্ট্র্যাটেজিকে অবহেলা করা হয়েছে। সন্ত্রাসী মামলাগুলোর (২০০৫ পর্যন্ত) কোনও নিষ্পত্তি হয়নি। একমাত্র কাসবের শাস্তি হয়েছে। দিল্লী হাইকোর্টে বিস্ফোরণ মামলাটি রায় দেওয়ার স্টেজে পৌঁছেছে। দিল্লী হাইকোর্টে বিস্ফোরণ মামলাটি চলাকালীন আই বি এবং এ টি এস-এর মধ্যে লড়াই শুরু হয়। মহারাষ্ট্র এ টি এস জার্মান বেকারী বিস্ফোরণ মামলাটি এন আই এ-এর হাতে দিতে অস্বীকার করে। দিল্লী পুলিশ আবু জিন্দালকে কাস্টডিতে ধরে রাখে।

২০০৮ সালে একটি আইন করে এন আই এ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সী)-এর পত্তন ঘটানো হয়। উদ্দেশ্য সন্ত্রাস আটকানো। কিন্তু তাদের এফ বি আই-এর মতো ফাঁদ পাতার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সন্দেহজনক সন্ত্রাসীকেও আটকানোর অনুমতি নেই। সন্ত্রাসীদের সম্পত্তি ও সন্ত্রাসের জন্য সংগৃহীত অর্থ বাজায়াপ্ত করার অধিকার নেই। এমন কি সন্ত্রাসীদের তালিকাও দেওয়া হয়নি তাদের।

আগেও ছিল না, এখনও নেই

২০১০ সালে আমেরিকা একটি পুলিশ ইউনিট তৈরি করেছে যার নাম ‘মাল্টিপাল এস্যাল্ট কাউন্টার টেররিজম অ্যাক্সান ক্যাপবেলিটি’। এটা তৈরি করা হয়েছে মুম্বাই অ্যাটাকের উপর নির্ভর করে। এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের পুলিশ মুম্বাই আক্রমণের রূপরেখা দেখে নানা ব্যবস্থা তৈরি করেছে। বাংলাদেশের গোয়েন্দা বাহিনী ২টি হেলিকপ্টার কিনেছে। বাংলাদেশের জি ডি পি (মোট উৎপাদন) ভারতের এক-এর পাঁচ ভাগ। ভারতের কমান্ডোদের সড়ক পথেই যাতায়াত করতে হয়। তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও নেই। মুম্বাই পুলিশ ৬০০০ সি সি টি ভি ক্যামেরা চেয়েছিল। কিন্তু কেনা হয়নি। আর আর পাতিল মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি লন্ডন গিয়েছিলেন ৬ জন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে। সিসিটিভি দেখা ও পরীক্ষার পরও সেই চুক্তি কার্যকর হয়নি।

আগস্ট মাসের ১ তারিখ দুজন পুলিশ অফিসারকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে বোমা নিষ্ক্রিয় করতে হয়েছে। বোমা নিষ্ক্রিয় করার পোষাক নেই। সরকারকে শত অনুরোধ সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় পোষাক পাওয়া যায়নি।

সবাই মিলে করি কাজ,
হেরে হেরে নাহি লাজ

আমাদের ১৫টি গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে। প্রতিদিন দুপুরে সবাই মিলে মিটিং হয়। ইতিমধ্যে ১০০০ মিটিং হয়েছে। কিন্তু একটি সন্ত্রাসী আক্রমণও ঠেকানো যায়নি।

দুর্নীতি কাঁটার মতো পুলিশের সার্বিক প্রস্তুতিতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ‘‘ইকনমিক অফেন্স উইং’’ বিমল আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে। তাকে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ৬ কোটি টাকার ‘বম্ব স্যুট’ কেনার অর্ডার দেয়। সে ৩৬টি ভালো স্যুট আফ্রিকা থেকে কেনে, বাকি ৪৪টি স্যুট চীন থেকে কেনে, যার গুণমান খুবই নিচু। এই ‘বম্ব স্যুটে’’ বোমা নিষ্ক্রিয় করার কাজে ব্যস্ত পুলিশ মারা যেত পারতো। কিন্তু চমকে দেবার ঘটনা এই— আগরওয়াল স্বীকার করেছে যে ৬ জন পুলিশ অফিসারকে সে ঘুষ দিয়েছে। ঘুষখোরদের নাম জানা যায়নি।

গোয়েন্দা দফতরে পোস্টিং মানেই হারিয়ে যাওয়া— সাধারণত এ কথাই ভেবে থাকেন পুলিশ অফিসাররা। ২০১১ সালে ১৫০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ১০ জন অফিসার বাড়ি চলে গেছেন। মহারাষ্ট্রের পুলিশের এই অভিজ্ঞতা। পুলিশের যা বেতন তার চেয়ে

মুম্বাইয়ে তাজ হোটেলে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। (ফাইলচিত্র)

বেতন বেশি পাওয়া যায় অন্য ক্ষেত্রে। তারা চলে গেছে কারণ তথ্য সংগ্রহ খুব বড় রোজগেরে পেশা নয়। মহারাষ্ট্রের এ টি এস-এর ৭৩২ জন স্টাফ থাকার কথা। কিন্তু ২৫০ জন কম রয়েছে। মুম্বাই এলিট কমান্ডো (ফোর্স ওয়ান) ২৬/১১-র আক্রমণের এক বৎসরের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তাদের বাড়ি ভাঙা ও দরজা ভাঙার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি।

চিন্তার শেষ নেই, কাজ করে লাভ নেই

এন এস জি কমান্ডোদের তৈরি করার জন্য সেনা জওয়ান থেকে বেছে নেওয়া হয় এবং ৬ মাসের মারাত্মক ট্রেনিং-এর পর ওদের বেস ক্যাম্প রাখা হয়, ২৬/১১-র সন্ত্রাসী আক্রমণের পর চারটি এন এস জি হার্ব তৈরি করা হয়। কিন্তু কমান্ডোদের ৬ মাসের বদলে তিন মাসের ট্রেনিং দেওয়া হয়। মানেশ্বরে এন এস জি কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই ও হায়দরাবাদ হার্বে রাখা হয়। কিন্তু মিলিটারি ও প্যারামিলিটারি হার্বে রাখার ব্যাপারে আধিকারিকরা অসন্তুষ্ট। মুম্বাই হার্বে ফায়ারিং রেঞ্জ বা ‘কিলার হার্ব’ নেই।

দরজা খোলা ও ভাঙার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি তাদের। এটা ভাগ্যের ব্যাপার তারা ছাদের তলায় থাকতে পেরেছিলেন। ২৪১ জন কমান্ডোকে কম আলোর ঘরে রাখা হয়েছিল।

গুজরাটে অক্ষরধাম মন্দিরে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। (ফাইলচিত্র)

এই বাড়িটি মুম্বাইয়ের যোগেশওয়ারী ভিকোরলি রোডে। প্রথমে বস্তিবাসীদের জন্য তৈরি বাড়িতে রাখা হয়। আন্ধেরীর পূর্ব এলাকায় নতুন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেই নতুন বাড়িতে ফাটল দেখতে পান তারা। আবার তাদের পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হয়। তাদের প্রশিক্ষণ ছিল নিম্নমানের। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণ বলেন, হার্ব তৈরি করা একটি বড় ভুল।

এন এস জি হার্ব চোখে দেখা যায়। পর্দার আড়ালে চিদাম্বরম আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। এন সি টি সি গঠনের চিন্তা করেন। এন সি টি সি হলো ন্যাশনেল কাউন্টার টেরিরিজম সেন্টার। বিহার গুজরাট তামিলনাড়ু ওড়িশা এবং পশ্চিমবাংলা থেকে বাধা আসে। ফলে এন সি টি সি এখন সাত বাঁও জলে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিন্ধে বলেন, এ ব্যাপারে তিনি সব রাজ্যের মত নিয়ে এগোবেন।

এটাই শেষ নয়। তিনি NATGRID তৈরির কল্পনা নেন। সমস্ত এজেন্সিগুলো একটা গ্রিড-এর আওতায় আসবে। তাও ব্যর্থ হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এর যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করছে। এমনকি ১৫০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। স্থির হয় ২১টি স্পর্শ কাতর Database তৈরি হবে। এখনও তা বাস্তবে প্রতিপালিত হয়নি। ব্যক্তি সম্পর্কে সংগৃহীত ডেটা-র অপব্যবহার হবে না। এই ডেটা সংগৃহীত হওয়া কথা— (১) ইন্টারনেট, (২) সেলফোন, (৩) ক্রেডিট কার্ড, (৪) মোটর সাইকেল ও গাড়ি, (৫) ইমিগ্রেশন, (৬) ইনকাম ট্যাক্স সিস্টেম থেকে।

NATGRID-এর ডেটা বা তথ্য কিভাবে ব্যবহার হবে তা অন্য এজেন্সিগুলো বুঝে উঠতে পারছে না। ১৫০০০ হাজার স্টাফের জন্য অফিস নেওয়া হয়েছে। কর্পোরেট আউটলুকে অফিস সাজানো হয়েছে। টেকনোক্রাটদের রাখা হয়েছে। নতুন উন্নত যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। চিদাম্বরম এক আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। যুক্তি হচ্ছে, ডেভিড কোলমেন হেডলি পাকিস্তানে চারবার গেছেন। তাঁকে ২৬/১১-র আগেই ধরা যেত যদি আমাদের ডেটাবেস থাকতো। আই বি অফিসাররা এর বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলছেন, এই ডেটাবেস-এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ করার অবকাশ রয়েছে। আবার পুলিশ তা জানাতে পারছে না।

আই বি প্রধানের NAGRID নিয়ে সমস্যা আছে। আই বি-র স্পর্শকাতর ডেটা নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেবে।

চিদাম্বরম এন এস জি-কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করেছেন। সিন্ধে ফিরে গেছেন ২৬/১১-র পূর্বাবস্থায়। তাঁকে জাগাতে আরও আক্রমণের দরকার হবে বলে মনে হয়। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কী হাল এবার বুঝুন।

(তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়া টু ডে)

মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ	প্রধানমন্ত্রীর অফিস/ক্যাবিনেট সেক্রেটারি
□ রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স	□ রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (র) □ ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অরগাইনেজেশন (এন টি আর ও) □ জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি
মাল্টি এজেন্সি সেন্টার/নোডাল সেন্টার ফর ইন্টেলিজেন্স	
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	**প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়**
□ ইন্টেলেজিন্স ব্যুরো □ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি □ ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড □ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স □ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স	□ ডিফেন্স ইনটেলিজেন্স এজেন্সি □ মিলিটারি ইনটেলিজেন্স □ ডাইরেক্টরেট অফ নোডাল ইনটেলিজেন্স □ ডাইরেক্টরেট অফ এয়ার ইনটেলিজেন্স □ কোস্ট গার্ড
□ নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো	**মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স**
□ সেন্ট্রাল ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স □ শাস্ত্র সীমা বল □ ইন্ডো টিবেটান বর্ডার পুলিশ □ অসম রাইফেলস	□ ডাইরেক্ট অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স □ সেন্ট্রাল ইকনমিক ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো □ ফিনানসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট □ ডাইরেক্টর অফ এনফোর্সমেন্ট □ ডাইরেক্টর অফ ইনকামট্যাক্স ইন্টেলিজেন্স

চিঠিপত্র

"আজমল কসাবের নামাজ-ই-জানাজা"

ইসলামাবাদ থেকে পি. টি. আই প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ আজমল কসাবের সাহাদাত (ইসলামের জন্য শহীদ) হওয়ার তিন দিন পর তার নামাজ-ই-জানাজা (অন্তিম নামাজ) অনুষ্ঠিত হলো লাহোরের নিকটবর্তী এক ময়দানে, সেখানে কয়েক হাজার জেহাদী মুসলমান তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান, নেতৃত্ব দেন ২৬/১১ মুম্বাই হামলার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হাফিজ মহম্মদ সইদ, ভারতের কোথাও কসাবের জন্য নামাজ-ই জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা এখনও জানা যায়নি।

এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুণ্ডা বিমান ঘাঁটী আক্রমণ করতে এসে এক পাক বৈমানিক ভারতীয় বায়ুসেনার গুলিতে বিমানসহ ভূপাতিত হয়ে নিহত হয়, ভারতীয় বায়ুসেনা তাকে সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় খড়গপুরের কাছে এক মুসলিম কবরখানায় কবর দেয়। তার নামাজ-ই-জানাজায় হাজার হাজার পাকপ্রেমী মুসলমান সমবেত হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানায়। এখনও তার সাহাদাত (এন্তেকাল/মৃত্যু) দিবসে পাকপ্রেমী মুসলমানরা তার কবরে ফুলমালা এবং রাত্রে মোমবাতি ও ধূপকাঠি দেয়।

জে. কে. এল. এফ্-এর প্রতিষ্ঠাতা মুকবুল বাটের, নরহত্যার দায়ে ১৯৮৪ সালে তিহার জেলে ফাঁসি হয় এবং ওই জেল চত্বরে তাকে কবর দেওয়া হয়। তার দেহ তিহার জেল থেকে তুলে কাশ্মীরে নিয়ে আসার জন্য পাকপন্থী মুসলমানরা দুবার প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখায় এবং পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ২০০৩ সালে হিজবুল নেতা সইফুল সম্মুখসমরে নিহত হলে তার দেহ কবর দেওয়ার সময় প্রায় ২৫ হাজারেরও বেশি পাকপ্রেমী মুসলমান তার সমাধিস্থলে পৌঁছোয়। শোকে আচ্ছন্ন অনেক বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশুরা কাঁদতে কাঁদতে তার দেহ প্রদক্ষিণ করে এবং আজাদির জন্য মুহুর্মুহু ধ্বনি দিতে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, যেসব ভারতীয় বীর সেনানী দেশমাতৃকার সম্মানরক্ষার্থে পাক-ভারত যুদ্ধে পাক-অধিকৃত অঞ্চলে জীবন উৎসর্গ করেছেন পাক সরকার তাদের প্রত্যেককে অত্যন্ত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার সঙ্গে কবর দেয়। অর্থাৎ গর্ত করে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় হাত-পা ধরে টানতে টানতে মাটিতে পুঁতে দেয়। রবীন্দ্র কৌশিক নামে জনৈক ভারতীয় গোয়েন্দা পাকিস্তানে ধরা পড়ার পর ১৮ বৎসর পাক জেলে কাটিয়ে ২০০২ সালে মারা গেলে পাক কর্তৃপক্ষ তাকে কবর দিয়ে দেয়। আমার প্রশ্ন, ভারত সরকার এ ব্যাপারে নীরব কেন?

ইসলাম ধর্মমতে কাফেরের মৃতদেহ কাঁধে বহন করা গুনাহ (পাপকাজ)। তাসখন্দে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর তার কফিন কাঁধে বহন করার অপরাধে তদানীন্তন পাক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ইসলামী মৌলবাদীদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে ধিক্কৃত হয়েছিলেন। এই অপরাধে আইয়ুবের কত দিনের নামাজ রোজার ফরজ (পুণ্য) মাইনাস করা হয়েছিল এখন আমার মনে নেই।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।**

কাসবকে সহানুভূতি, সন্ত্রাসকে প্রশ্রয়েরই নামান্তর

অনেক টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত কাসব যবনিকার পতন ঘটলো। রাষ্ট্রপতির দৃঢ়তায় কাসব তার প্রাপ্য চরম শাস্তি পেয়েছে। যে ব্যক্তি দেশের শতাধিক মানুষের মৃত্যুর কারণ তার জন্য মৃত্যুদণ্ডই উপযুক্ত বিচার। ২৬/১১-র সেইদিনে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবার পরিজনদের ক্ষতে একটু হলেও প্রলেপ পড়ল। কাসবের বিচার নিয়ে দীর্ঘ চার বছর ধরে যে নাটক চলছিল তা দেশের মানুষের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশের এতো বড় শত্রু সে বহাল তবিয়তে আছে, দেশবাসী এটা মানতে পারছিল না। মনে সংশয়ও জাগতে শুরু করেছে, যেখানে দেশের আইন একজন বহিঃশত্রুর প্রতি কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে না সেখানে নাগরিকরা কতটা সুরক্ষিত? এই সময়ে কাসবের মৃত্যুদণ্ড যথাযথ। অন্তত মানসিক শান্তির জন্য।

তবে এভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি উচিত? এ নিয়ে বিতর্ক উঠতে শুরু করেছে। অনেকে বলেছেন হত্যার বদলে হত্যা করে অপরাধ কমেছে এরকম কোনও নজির নেই। কিন্তু কাসবের মতো জঘন্য অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের বদলে বিকল্প শাস্তি কি আছে? এর কোনও উত্তর নেই। কাসবের দিকে যদি আমরা মানবতার দৃষ্টিতে তাকাই তাহলে সেদিন যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদেরকে কোন দৃষ্টিতে দেখবো? যে সেনারা দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছে তাদের প্রতি দেশের কি কোনও কর্তব্য নেই? আর এই মানবতার অজুহাতে সন্ত্রাসবাদীরা যদি পার পেয়ে যায় তাহলে সন্ত্রাসবাদের প্রতিই বা কি বার্তা যাবে? সন্ত্রাসকে কড়া বার্তা দিতে মৃত্যুদণ্ডই উপযুক্ত শাস্তি। এক্ষেত্রে শাস্তি লঘু করলে তাদেরকে প্রশ্রয়ই দেওয়া হবে। তাই কাসবের মতো সংসদ হামলায় অভিযুক্ত অফজল গুরুকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। যারা মানবিকতাকে রক্ষা করে তারাই সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য, মানবতার শত্রুরা নয়।

—**বিরাজ নারায়ণ রায়, কলকাতা-৬।**

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

পড়ুন ও পড়ান

স্বস্তিকা

প্রতি সংখ্যা মূল্য ৭.০০ টাকা

বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ৩২৫ টাকা

গ্রামের তরুণদের এখন চাষবাসে আগ্রহ কমছে

রমাপ্রসাদ দত্ত

বিখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এবং এদেশের সবুজ বিপ্লবের রূপকার এম এস স্বামীনাথন কদিন আগে গভীর আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন, চাষের জমি অন্য কাজে ব্যবহার হচ্ছে। নগরপত্তন আর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে জনবসতি। কলকারখানা গড়ে উঠছে। একের পর এক চাষের জমি হস্তান্তর হচ্ছে। চাষীর বা ভূস্বামীর কাছ থেকে জমি নেওয়া হচ্ছে তিন ভাবে। ১. দালাল মারফত। ২. সরাসরি। ৩. সরকারি উদ্যোগে। কোনও জমির উপর নজর পড়লে তা যে-কোনও ভাবে দখলের রীতি আগে ছিল। একসময় বলা হোত, 'নারী আর জমি তার, লাঠির জোর যার।' জমি গ্রাস করার রূপবদল হয়েছে। দশ বছর আগে শহর থেকে একটু দূরে গেলে উদার আকাশ, বিস্তীর্ণমাঠ, সবুজে ভরা ক্ষেত দেখা যেত। এখন সেখানকার ছবি বদলে গেছে পুরোপুরি। বাড়ির পর বাড়ি কম নয়। জনচাপও বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। জমি তাই নেওয়া হচ্ছে। টাকা দেখালে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হচ্ছে অনেক জায়গায়। অন্যরকম টোপও থাকছে। এমন ফাঁদ তৈরি হচ্ছে যার দরুন জমি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকছে না। এসব ছবি দেখতে অভ্যস্ত। দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে কৃষিভূমি। কৃষিবিজ্ঞানী স্বামীনাথন স্পষ্ট জানিয়েছেন, এখনকার তরুণ সমাজ কৃষিকর্মে আগ্রহী নয়। কম পরিশ্রমে তারা অন্য ধরনের আয়ের পথ খুঁজছে। ফলে চাষবাস না করে জমিকে অন্য কাজে ব্যবহারের ঝোঁক বেড়ে গেছে। ব্যাপারটা দ্রুত সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়াচ্ছে গ্রামীণ ভারতের তরুণ সমাজের মনে। ফল দাঁড়াবে ভয়ঙ্কর। দেখা দেবে খাদ্য-সংকট। টাকা পকেটে থেকে যাবে। খাবার থাকবে শুধু সম্পন্ন মানুষদের জন্যে। কিন্তু তাও কি যথেষ্ট হবে একসময়? খাদ্য-সংকট ক্রমাগত বাড়তে থাকলে শেষপর্যন্ত ভয়াবহ জীবন-সংকট দেখা দিতে বাধ্য।

ছোট ছোট জমিতে চাষের খরচ বেশি। উৎপাদনও আশানুরূপ নয়। সমাধানের জন্যে আধুনিক কৃষিপদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। একসঙ্গে বড় জমি থাকলে চাষের খরচ কমবে। উৎপাদনও বাড়বে। উন্নত কৃষির আশীর্বাদ এদেশের জমিতে মিলেছিল বলেই আমরা খাদ্যে স্বনির্ভর হতে পেরেছিলাম। অনেকেরই মনে পড়বে এদেশের অভুক্ত মানুষদের জন্যে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে। যদি সেই খাবার না আসত দলে দলে মানুষ মারা যেত।

দুর্ভিক্ষ দুভাবে হতে পারে। ১. প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ২. মানুষের তৈরি। প্রকৃতি অপ্রসন্ন হলে জমিতে ঠিকমতো উৎপাদন হয় না। এক্ষেত্রেও মানুষের কিছু ভূমিকা অনেক সময় থাকে। মানুষ বেপরোয়া অত্যাচার চালায় প্রকৃতির উপর। তার ফলে বড়রকম বিপর্যয় আসে। মানুষের তৈরি খাদ্য-সংকটের পিছনে হিংসা আর লোভ। বিপদের দিনে সংকটের দিনে একসঙ্গে খাবার এবং জল ভাগ করে গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের দেশের ঋষিরা। কারণ যদি সংকট মোকাবিলায় প্রত্যেকে উদ্যোগ নেয় তাহলে সমবেত সেই প্রয়াসে বাধা পেরোনো সম্ভব। কিন্তু জমির রূপান্তর ঘটলে, চাষের বদলে অন্যদিকে আগ্রহ জাগলে কীভাবে খাদ্য সংকটমোচন করা যাবে? আজ হয়তো দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর। কিন্তু কৃষি উৎপাদন না বাড়লে এবং ক্রমাগত কমতে থাকলে খাবারের ভাঁড়ারে টান পড়বে। আর তখনই অসৎ ব্যবসায়ীরা মুনাফার জন্যে নানারকম খারাপ মতলব আঁটবে। আমরা নিজেরাই দায়ী হবো সেই সংকট সৃষ্টির জন্যে।

এম এস স্বামীনাথন বক্তৃতা করেছিলেন গুজরাটের ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট, আনন্দ-এ। কমাস আগে জীবনাবসান হয়েছে এদেশের দুধ বিপ্লবের মুখ্য পরিকল্পক ভার্গিস কুরিয়েনের। সমবায় প্রথায় দুধের ব্যবসার মাধ্যমে কি করা যায় তা কুরিয়েন দেখিয়েছেন। সমবেত উদ্যোগের সপক্ষে জোরগলায় কথা বলেছেন যিনি তাঁর স্মৃতিতে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছে আনন্দ-এর সংস্থা। প্রতি বছর এই স্মৃতি-বক্তৃতা হবে। প্রথম বক্তৃতা দেন স্বামীনাথন। হতাশা প্রকাশ করলেও আশার ছবিও তুলে ধরেছেন। কৃষিভিত্তিক ব্যবসাকেন্দ্র গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলার কথা বলেছেন। তাতে অসংখ্য কৃষিজীবী পরিবারের প্রয়োজন মিটবে।

স্বামীনাথনের বক্তৃতার বিষয় ছিল : 'গ্রামীণ মানুষের জীবিকা ও পুষ্টির নিরাপত্তার জন্যে সমবায়ের পথ।' তিনি জানিয়েছেন, কৃষি ক্ষেত্রে এমন অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে যা সমাধানের জন্যে দুধের ক্ষেত্রের কিছু দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়। তিনি বারবার বলেছেন দুধ বিপ্লবের ক্ষেত্রে সমবায় উদ্যোগে যা সম্ভব হয়েছে তা কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে সুফল মিলবে। গুরুত্ব দিয়েছেন কৃষি সম্পর্কে ভাবনার প্রসার ঘটানোর দিকে। তাহলে কৃষির পাশাপাশি আরও অনেককিছু পাওয়া যাবে। আনন্দ-এর এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাট কো-অপারেটিভ মিলক মার্কেটিং ফেডারেশন, ন্যাশানাল ডেয়ারি ডেভলাপমেন্টে বোর্ড, ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেয়ারি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার কর্মীরা। এদেশের কৃষিবিজ্ঞানী যেদিকে আলোকপাত করেছেন তা নিয়ে দেশের সব জায়গায় ভাবনা শুরু হবে কি?

ঐতিহাসিক দুর্গ জালোর

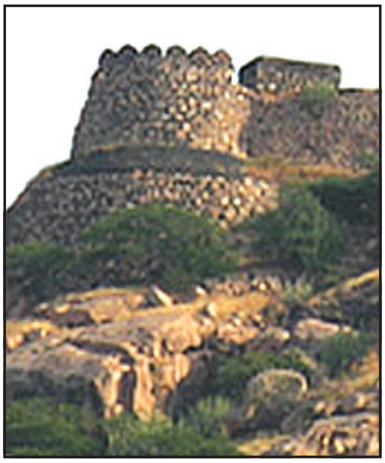

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

বীরভূমি রাজস্থানের যোধপুর শহর। তার ১৪০ কিমি দূরে বর্তমান জালোর শহরের দক্ষিণে দুর্গম আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীতে অবস্থিত দুর্ভেদ্য জালোর দুর্গ। জালোর দুর্গ তার বিশালত্ব, প্রাচীনতা এবং সুদৃঢ়তার কারণে শুধু রাজস্থানেই নয়, আসমুদ্রহিমাচলে বিখ্যাত।

আরাবল্লী পর্বতমালার অন্যতম শাখাশ্রেণী 'সোনগিরি'-র শীর্ষে অবস্থিত জালোর দুর্গ, ভূমি থেকে যার উচ্চতা প্রায় ১২০০ ফিট। দুর্গের দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান, শক্তিশালী কবাট, বুরুজ ও সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার ফলে দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অতুলনীয় এবং দুর্ভেদ্য। দুর্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থল হলো--- প্রাচীন শিবমন্দির, সাদা মার্বেলের তৈরি বৃহৎ অপূর্ব শিবলিঙ্গ রূপে মহাদেবের অবস্থান, রাঠোররাজা মানসিংহের প্রাসাদের কারুকার্য মনোমুগ্ধকর। দুর্গচত্বরে অবস্থিত জৈন তীর্থঙ্করদের সমর্পিত তিনটি মন্দির, যার মধ্যে পরেশনাথের মন্দির সর্ববৃহৎ। এছাড়া রাণীমহল, দেবী চামুণ্ডা মন্দির, তোপখানা, রাজকুমার বীরমদেবের 'ছতরী' এবং মুসলিম সন্ত মালিক শাহের দরগা প্রভৃতি দুর্গের অন্যতম দর্শনীয় স্থান, দুর্গে বেশ কয়েকটি পুষ্করিণীর অবস্থান এবং রাণী মহলে অবস্থিত বিশাল শস্যভাণ্ডার প্রভৃতির ফলে বোঝা যায় দুর্গের দীর্ঘ অবরোধ সত্ত্বেও কদাচিৎ খাদ্য এবং পানীয় জলের অভাব অনুভূত হোত।

সম্ভবত দশম শতাব্দীর উত্তরার্ধে পরমার বংশীয় রাজা বাক্‌পতি মুঞ্জ দ্বারা শক্তিশালী জালোর দুর্গের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়। ১১৮১ খৃস্টাব্দে নাডোলের চৌহানরাজ কীর্তিপাল অন্তিম পরমার বংশীয় রাজা কুমারপালকে পরাজিত করে জালোর নিজ অধিকারভুক্ত করেন। কীর্তিপাল জালোরে প্রতিষ্ঠা করেন চৌহান বংশের নতুন শাখা 'সোনীগরা' রাজবংশ। মহারাজ উদয়সিংহের (১২০৫-১২৪৯) শাসনকাল ছিল জালোরের সুবর্ণ যুগ। তিনি জালোরকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলেন এক শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য। উদীয়মান এই হিন্দু রাজ্যের শক্তি খর্ব করতে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস ১২১১-১৬ সালের মধ্যে বিপুল সৈন্যদলসহ জালোর আক্রমণ করে। দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও বীর সোনীগরা রাজপুতদের অমিত বিক্রমের ফলে মুসলমান বাহিনী পরাজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। ইলতুৎমিস যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি উদয়সিংহকে স্বতন্ত্র নরপতি রূপে ও জালোরকে স্বতন্ত্ররাষ্ট্র রূপে স্বীকার করেন। মহারাজা উদয়সিংহ শুধু প্রজাবৎসল নরপতি রূপে বা সুদক্ষ যোদ্ধা রূপেই নয়, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এক বিদ্বান রাজা রূপে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ভরত রচিত ''ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রের'' তিনি ছিলেন এক মহান বিশারদ। উদয়সিংহের পর তার বীর উত্তরসূরীগণ জালোর রাজ্যকে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে পরিণত করেন। একাধিকবার তারা দিল্লীর মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে বিজয়ী হন।

মহারাজ কান্হারদেবের (১২৯৬-১৩১০) শাসনকালে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খলজী তার বিশাল ফৌজকে জালোর অধিকার করতে পাঠান। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ দুর্গে সুলতানী বাহিনীর বারংবার আক্রমণ প্রতিহত করেন বীর সোনীগরা রাজপুতগণ। অবশেষে ১৩১০ সালে আলাউদ্দিন স্বয়ং বিপুল বাহিনী সহকারে জালোর আক্রমণ করে। সুদৃঢ় দুর্গের ছত্রছায়ায় রাজপুতগণ গেরিলা যুদ্ধের সাহায্যে সুলতানী ফৌজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন। কিন্তু এক রাজপুত সর্দারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ক্ষণিকের মধ্যে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় এবং পঙ্গপালের ন্যায় মুসলমান বাহিনী প্রাচীরের অরক্ষিত স্থান দিয়ে প্রবেশ করতে থাকে দুর্গে। অন্তিম সংগ্রামে প্রস্তুত রাজা কান্হারদেব পুত্র কুমার বীরমদেবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

কান্হারদেবের পত্নীগণের নেতৃত্বে রাজপুত নন্দিনীগণ জৌহরের পবিত্র অনলে আত্মবিসর্জন করেন। অসীম বীরত্ব সহকারে শত্রুসৈন্য সংহার করে চৌহানপতি মহারাজ কান্হারদেব রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন। সোনীগরা রাজপুত বংশের অন্তিম সম্রাট মহারাজ বীরমদেব সাড়ে তিনদিনের অসম প্রতিরোধের পর অবশিষ্ট চৌহান বীরগণের সঙ্গে দুর্গের কবাট উন্মুক্ত করে শত্রুসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দুর্গে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ও অন্তিম জৌহরের অগ্নিতে বীরমদেবের পত্নী ও অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়ানীর দেহ হয় ভস্মীভূত। অতুলনীয় শৌর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বীরমদেব ও বীর রাজপুতগণ রণে বীরগতি প্রাপ্ত হন। প্রথমবার জালোর ম্লেচ্ছ সৈন্যদ্বারা হয় পদানত, লুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত।

চতুর্দশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতকে জালোর ছিল বিহারী পাঠান অধিকৃত অন্যতম শক্তিশালী মুসলিম রাজে। ১৬১৭ সালে রাঠোররাজ গজসিংহ পাঠানদের পরাজিত করে জালোরকে তার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত করেন। মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের চক্রান্তে গদিচ্যুত যোধপুর রাজ্যের উত্তরাধিকারী কুমার অজিতসিংহ মুঘলদের সহিত সন্ধির শর্ত অনুসারে জালোর শাসনের অধিকারপ্রাপ্ত হন। বীর শিরোমণি দুর্গাদাস রাঠোরের সাহায্যে জালোরকে কেন্দ্র করে অজিত সিংহ তাঁর পৈতৃক রাজ্যের স্বাধীনতার সংগ্রাম জারি রাখেন।

১৭০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি যোধপুর বা মাড়ওয়ার রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রূপে বিকশিত হয় জালোর।

সোনগিরি পর্বতের শীর্ষে শোভায়মান জালোর দুর্গ বীর সোনীগরা চৌহানদের অতুলনীয় শৌর্যের সাক্ষীস্বরূপ অদ্যাপি গর্বিত মস্তকে দণ্ডায়মান।

পল্লীবাংলার সর্বজনীন উৎসব নবান্ন

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

বাঙালি উৎসব ভালোবাসে। বাংলার তাই চালু কথা— বারো মাসে তেরো পার্বণ। হিসাব করলে বেশিই হবে। তার মধ্যে জনপ্রিয় উৎসব নবান্ন। এই উৎসব খুব প্রাচীনও। এবং এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয় গ্রামবাংলার পল্লী অঞ্চলে। পেকে ওঠা নতুন ধান আমনকে কেন্দ্র করে এই উৎসব। কৃষিজীবী বাঙালি হিন্দুর প্রাণের উৎসব এই নবান্ন।

ভারতের অর্ধেকের বেশি মানুষ অবশ্য গম পছন্দ করে। কিন্তু বাঙালির প্রধান খাদ্যশস্য ধান। ধান শুধু পেট ভরায় না, প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটায়। উদ্বৃত্ত ধান বিক্রি করেই তার সংসার চলে। তাই ধান শুধু শস্য মাত্র নয়, ধান দেবী লক্ষ্মীস্বরূপা, ধানের শিষ, ধান পূজিত হয় দেবভাগে। ধান এল মানে বাড়িতে মা লক্ষ্মী এল, অগ্রহায়ণ, পৌষ মাস বাঙালির কাছে লক্ষ্মীমাস। অগ্রহায়ণ মাসের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীভগবানের মুখেও উচ্চারিত— মাসানাং মার্গশীর্ষঃ (শ্রীমদভগবদ্‌গীতা ১০।৩৫)। এই সময় বাংলার ঘরে অন্তত অন্নাভাব থাকে না। ধানকে ঘিরে কত আচার, অনুষ্ঠান, ব্রত। এক সময় বাঙালি হিন্দুর জীবনে ধর্ম, দেবতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বাড়িতে নতুন ফল-মূল হলে দেবতার ‘থানে’ না দিয়ে সে গ্রহণ করত না। তাই লক্ষ্মীরূপা ধানকে ঘিরে তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা।

অগ্রহায়ণের প্রথমদিনে (কোথাও কার্তিক সংক্রান্তিতে) মুট্‌ বা ‘মুঠি’ আনা হয়। বাড়ির কর্তা বা অন্য কোনও ব্যক্তি স্নান করে, শুদ্ধ বসন পরে কাস্তে হাতে মাঠে যায়। এক মুঠো ধান কেটে, পট্টবস্ত্রে জড়িয়ে, মাথায় নিয়ে ঘরে ফেরে, ফেরার পথে কোথাও দাঁড়ায় না, বা কারও সঙ্গে কথা বলে না, বাড়ি এলে গৃহকর্ত্রী তার পায়ে জল দেয়, শাঁখ বাজায়, অন্যেরা উলুধ্বনি দেয়। ধান্যলক্ষ্মীকে মাঙ্গলিক আচারে বরণ করার পর হয় নবান্ন উৎসব।

তবে ‘মুঠি’ আনার নির্দিষ্ট দিন বা তিথি থাকলেও নবান্নের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু নেই। বর্তমানে উচ্চফলনশীল স্বল্পমেয়াদি চাষ শুরু হওয়ার ফলে ধান কাটা শুরু হয়ে যায় অনেক আগেই, কিন্তু ‘মুঠি’ আনা চালু আছে আগের মতোই, নবান্নও পালিত হয় প্রবলভাবে, উৎসবের আনন্দও কমেনি বিন্দুমাত্র।

সাধারণত গ্রামের যাঁরা মাথা তাঁরা একত্রিত হয়ে গ্রামবাসীর সুবিধা অসুবিধা সবদিক চিন্তা করে একটা দিন স্থির করেন। তারপর গ্রামের ঘোষক ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নবান্নের দিনটি জানিয়ে দেয়। দিনটি জানার জন্য ছোট বড়ো সবাই যেন উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ হয়ে থাকে। অন্যান্য উৎসব বা পার্বণের মতো নবান্ন তাই সর্বত্র একই দিনে পালিত হয় না বরং বিভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের আগমন ঘটে। আর আত্মীয় স্বজনে, বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হয়ে উৎসব পালনের আনন্দ-ই আলাদা।

কোনও কোনও গ্রামে এই উপলক্ষে দেবী অন্নপূর্ণার মূর্তি গড়ে পুজো দেওয়া হয়। দেবীর পাশে, ভিখারীর বেশে শিব, অপর দিকে নারদ, কোথাও বা নারায়ণ। বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার মজুরহাটি গ্রামে এই মূর্তিতেই পূজা হয়ে গিয়েছে।

আগের দিন বাড়ির মেয়েরা গোবর জল দিয়ে উঠোন, খামার ভালভাবে নিকিয়ে পরিষ্কার তকতকে করে রাখে। সর্বত্র একটা শ্রী ও শুচিতার ভাব ফুটে ওঠে। সকাল হলেই ছেলেমেয়েরা স্নান করে নেয়। অগ্রহায়ণে ঠাণ্ডা পড়লেও উৎসবের উত্তাপে আজ যেন শীত করে না। এরপর মেয়েরা সযত্নে আলপনা দেয়। কুমারী, কিশোরী বা বাড়ির বৌ ভেজা চুল পিঠে এলিয়ে শুদ্ধ বসন পরে একটি কাঁসা, পেতলের রেকাবিতে নতুন ধানের আতপচাল, কলা, কমলা, আপেল, আদাকুচি, মূলাকুচি, বাতাসা, কাঁচা দুধের নৈবেদ্য

সাজিয়ে দক্ষিণাসহ মন্দিরের বারান্দায় রাখে, পরে প্রসাদ নিয়ে বাড়ি আসে।

গৃহকর্তা ধুতি পরে, কাঁধে নতুন গামছা চাপিয়ে কলাপাতার ছোট টুকরোয় সোপকরণ ভোজ্য গৃহদেবতা, গ্রাম্যদেবতা, তুলসীতলা, গোয়ালঘর, শস্যগোলার সামনে এবং লোকান্তরিত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে বিভিন্ন স্থানে নিবেদন করেন।

তারপর সকলকে নিয়ে প্রসাদ গ্রহণ। আতপচালের গুড়ো, কাঁচাদুধ, কর্পূর, আদা, মুলো বাটার মিশ্রণে প্রসাদটি হয় বেশ উপাদেয়। সঙ্গে থাকে বিভিন্ন ফলমূল, মিষ্টান্ন। বোঁদে, জিলিপি আবশ্যিক পরিবেশনার মধ্যে পড়ে। অনেক বাড়িতে জিলিপি ভাজা হয়, বোঁদে তৈরি হয়। ভিন্ গ্রাম থেকে ময়রারা আসে, গ্রামে মিষ্টির দোকান বসে। এরপর মধ্যাহ্ন ভোজন। সাধারণ ভোজন তো নয় যেন ভোজ। ডাল, শাক, বিভিন্ন তরকারি, মাছের ঝোল, টক, চাটনি, পায়েস-এর সঙ্গে ন' রকমের ভাজাভুজি।

ন' এর কোটা পূরণ করতে আলু, বেগুন, মুলো, সিম-এর সঙ্গে আখের টুকরো, নারকেলের খণ্ড, পানিফল, বড়িও ভাজা হয়। অবশ্য এসব খেতেও বেশ মুখরোচক লাগে।

পরদিন 'পান্ত নবান'। এদিন 'মাংস মুখ' করা চাই। গ্রামের বিভিন্ন পল্লীতে খাসি কাটার ধুম পড়ে। তবে খাসি তো মহার্ঘ। যাদের সে সামর্থ্য নেই তারা দেশি মুরগী, হাঁস কাটে, তাছাড়া আছে সস্তার পোলট্রি মুরগী। দেদার বিকোয়। খাওয়া হয় গরম গরম মাংস ভাত।

ছেলেমেয়েদের উদ্যোগে যাত্রাপালা, নাটক হয়, বসে কবিগানের আসর। তবে এখন শহরের দেখাদেখি গ্রামেও শুরু হয়ে গেছে 'বিচিত্রানুষ্ঠান' 'হাঙ্গামা' 'ফাঙ্গামা'। গ্রাম মাতাতে শহর থেকে আসছে 'লতাকণ্ঠী', 'আশাকণ্ঠী', 'কিশোর' বা 'রফিকণ্ঠী', আসছে সদলবলে ঝিংচাক 'অর্কেস্ট্রা পার্টি'। নৃত্য প্রদর্শনে 'মিস মধুমিতা'।

সেই কবে দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'পল্লীবৈচিত্র্য' গ্রন্থে 'নবান্নে'র অপরাহ্ণের ছবি এঁকেছিলেন : ''গ্রামস্থ বৃদ্ধেরা হুঁকা টানিতে টানিতে দাবা ও পাশা খেলিতে বসিয়া গিয়াছেন, গড় গড় করিয়া হুঁকা ডাকিতেছে, বিসুবিয়সের ধূম উদ্‌গিরণের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিতেছে, 'কিস্তী!' 'কচেবারো' প্রভৃতি শব্দের বিরাম নাই। একটু আড়ালে বসিয়া যুবকদের দল সশব্দে তাস পিটিতেছে।'' হিংস্র দলাদলি, রাজনীতির পাকে পড়ে ১৩১২ বঙ্গাব্দে লিখিত এই ছবি আজ দূর অতীত। পশ্চিমবঙ্গ আজ পালটে গেছে। তবু প্রতি বছর নিঃশব্দে হেমন্ত আসে। তার হাত ধরে গ্রামবাংলায় সমারোহের সঙ্গে আসে নবান্ন। এ রকম সর্বজনীন উৎসব। কিন্তু কৃষিজীবী বাংলায় দুর্গা পূজার বার্তা আনন্দের সঙ্গে নিয়ে অসে অনেকের জীবনে দুর্ভাবনা। তার সারা বছরের সম্পদ ধান ফুরিয়ে এসেছে। পাকতে এখনও বিলম্ব আছে। অনেককে তাই ধার দেনা করে ছেলেমেয়ের জন্য নূতন জামা কাপড় কিনতে হয়। নবান্নে সেই বালাই নেই, মাঠে মাঠে ধান সোনার বরণ ধারণ করেছে, গৃহগত হওয়ার অপেক্ষা কেবল। সবার মনে খুশিভাব। শাক-সবজির বাজারও এ সময় বছরের অন্য সময়ের চেয়ে সস্তা। মৃদুমন্দ শীতে আবহাওয়াও মনোরম। এরকম প্রশান্ত পটভূমিতে পালিত নবান্ন তাই পল্লীবাংলার যথার্থ সর্বজনীন উৎসব।

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী
(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩
ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ শিবির

পুণ্যস্নান—১৩ জানুয়ারি, ২৭ জানুয়ারি,১০ ফেব্রুয়ারি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৫ দিন থাকা-খাওয়া ১০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা।
ট্রেনের টিকিট নিজেরা কাটবেন।
স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা আছে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—
রামকৃষ্ণ আশ্রম,
৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কালকাতা-১৩
ফোন : ২২৬৫-৬৭০৪,
৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

শিশু-উৎসবের উদ্যোগ

বছরের শেষে ছোটোদের নিয়ে একটা মেলা করার কথা হোতুর মাথায় রয়েছে। কোতুকে জানাতেই সে বলল, 'আমরা ছোটোদের হাতের কাজের প্রদর্শনী, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, নাচ গানের অনুষ্ঠান করতে পারি।' বিভিন্ন স্কুলে যোগাযোগের জন্যে দুজনকে ভার দিতে হবে। একটু ভারিক্কি গোছের অথচ হাসিখুশি মেজাজের একজনকে চাই। যে খাটতে পারবে, ঘুরতে পারবে, সবাইকে বোঝাতে পারবে। কদিন খাটতে হবে দিনরাত এক করে— সেজন্যেও যেন তৈরি থাকে। হোতুর চেনাশোনা লোকদের মধ্যে রয়েছে দ্রোণ রায়। একটা সরকারি স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক। ছোটোদের অঙ্কের ভয় কাটিয়ে বিষয়টা সম্পর্কে কীভাবে আকর্ষণ জাগাতে হয় সেটা জানে। ছোটোদের জন্যে লেখে আঁকে। গান গায়। নাটক করে। দ্রোণ খাটতেও পারে। তাকে খবর দিতেই স্কুলের শেষে চলে এলো হোতুর কাছে। চিকলিকে কিছু খাবার আনতে পাঠিয়ে কথা শুরু করতে চাইল হোতু। ছ'জনকে ডেকেছে হোতু। যাদের নিয়ে কাজ করার সমস্যা নেই। একেকজনের একেকদিকে দক্ষতা রয়েছে। আর সবচেয়ে বড়কথা, মিলেমিশে কাজ করার মতো মন রয়েছে। ছোটোদের নিয়ে কাজ করার উপযুক্ত সকলে নয়। ছোটোদের ভালোবাসতে না পারলে তাদের বন্ধু হতে না পারলে কাজ করা কঠিন।

দ্রোণ ছাড়া হাজির জয়ন্ত দাস, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়, রুদ্রজ্যোতি ঘোষ, ভাস্কর চক্রবর্তী, দেবজিৎ গুপ্ত। প্রত্যেকেই ছোটোদের জন্যে কাজ করে। নিজেদের পরিচিতি আছে। কথা শুরুর আগে হোতু বলল, 'তোমরা পরস্পরের পরিচয় জেনে নাও। জানা থাকলেও বলে দিচ্ছি। প্রত্যেকে কাগজ কলম নাও। আমরা কি করতে চাই, কীভাবে করতে চাই তা ঠিক করবো। কত খরচ করা সম্ভব হবে তাও ঠিক হবে। কোন কোন সূত্রে টাকা আসতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করে নিতে অসুবিধে নেই। প্রয়োজনীয় অনুমতি যেখান থেকে লাগবে তা নিয়েও কথা হবে।' কোতু সকলের পিছনে বসল। হোতু বলেছে, 'তুমি কিছু বলবে না আগ বাড়িয়ে। সব শুনবে। তোমাকে কিছু বলতে বলা হলে জানাবে।'

চিকলি আর শিট্টু খাবার দিলো। লুচি বোঁদে আর চা। দ্রোণ একটা কাগজে ছক তৈরি করে এনেছিল। সে বলল, 'পথশিশুদের নিয়ে আমরা নাটক করি। যদি আপনারা অনুমতি দেন তাদের একদিন সন্ধের অনুষ্ঠানে রাখা যায়।' সকলেই বলে উঠল, 'দারুণ ব্যাপার।' হোতুর মুখে হাসি। প্রস্তুতি-পর্বের প্রথম সভাতেই দ্রোণ সকলের কাছে প্রিয় হলো। সে একে একে অনেক কিছু জানাল। সবই যুক্তপূর্ণ। ইন্দ্রজিৎ বলল, 'দ্রোণকে চিনি অনেকদিন। ওয়ে এতরকম কাজের কথা ভাবে জানা ছিল না।' হোতু বলল, 'ইন্দ্র তুমি কি করতে চাও?' সে একটা বড় কাগজে আছে। সে বলল, 'আমরা যাতে কিছু বিজ্ঞাপন পাই সেটা দেখবো। একটা স্মারক পুস্তিকা সেজন্যে বের করা যাবে। তাছাড়া ছোটোদের কাজে যারা সাহায্য করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।' জয়ন্ত, ইন্দ্র, রুদ্রজ্যোতি, ভাস্কর, দেবজিৎ আলোচনায় অংশ নিল। কাজ ভাগ হলো প্রত্যেকের।

চিকলি শিট্টু আরেকবার চায়ের ব্যবস্থা করল। ঠিক হলো সপ্তাহের তিনদিন সন্ধেয় সবাই জড়ো হয়ে আলোচনা করবে কতটা কাজ হলো। একমাস সময়। হোতু বলল, 'তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের পেশার কাজ মন দিয়ে করে একটু সময় দিলেই হবে। আরও কয়েকজনকে আমরা পাবো।' অর্জুন ঢুকল প্রায় শেষে। সে বলেছিল, 'একটু দেরি হবে।' হোতু বলল, 'চা খাও। তুমি পাশে থাকো। এখানেও পাশে থাকবে।'

কোতু এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সে বলল, 'আমরা উৎসবের একদিন সকালে 'সকলের জন্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য' এই নামে একটা পদযাত্রা করতে পারি না কি?' দ্রোণ বলল, 'ভালো প্রস্তাব।'

হোতু বলল, 'অনেক পরিশ্রম করতে হবে কোতু। কদিন কাজ করো মন দিয়ে।'

কৌশিক গুহ

বইয়ের টানে

বইয়ের সঙ্গে ভাব

ছোটোদের বইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে অরুণ সবসময় ভাবে। একটু একটু করে সব শেখা। হাঁটতে শেখা, কথা বলতে শেখা। কত কিছু চিনতে শেখা। সবাই ধাপে ধাপে এগোয়। হামাগুড়ি দিয়ে উঁচু জায়গায় ওঠার মজা আছে। তারপর এক একটা ধাপ পেরিয়ে উঠে খিল খিল করে হাসে। নতুন একটা কাজ করতে পারার আনন্দ ছোটোদেরও হয়। বড়োদের মধ্যে যাঁরা স্নেহ ও যত্নে ছোটোদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সবসময় তৈরি তাঁরা সব দেখেন। আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের মনে। বড়োদের জুতোর দিকে নজর থাকে ছোটোদের। পায়ে গলিয়ে নেয়। কোন জুতোর পাটি কোন পায়ের তা তখনও জানে না। বড়োদের মুখে হাসি থাকলেও থাকে পড়ে যাওয়ার ভয়। ওইভাবে ছোটোরা পড়তে পড়তেই শেখে নিজের জুতো পরে হাঁটতে।

ছোটোদের ঝোঁক থাকে বড়োদের বই নেড়েচেড়ে দেখার। বাবা-মা, দাদু-দিদা, দাদা-দিদির বই খাতাপত্র খুলে তাদের চশমা পরে আনন্দ পায়। সেখানেও মজা। একটু বড়ো হওয়ায় মায়ের ভয়, বই ছিঁড়ে ফেলবে। বাবা বলেন, 'না না ছিঁড়বে না।' অল্প বড়ো দাদার বই ছিঁড়ে ফেললে সে চেঁচামেচি করে, 'মা, বোন আমার বই ছিঁড়ে ফেলল।' দাদা হয়তো একটু কড়া শাসন করে বোনকে। মা দুজনকে সামলায়।

এরপর স্কুলে যাওয়া। নিজের বইপত্র যত্নে রাখা। টিফিন খাওয়া। পড়তে লিখতে লেখার সঙ্গে চলে নাচ গান আবৃত্তি নাটক শেখা। ছোটোরা দিনে দিনে বড়ো হয় ওইভাবে। জন্মদিনে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলা : 'সব কিছুতে বড়ো হও।' সেই বড়ো হওয়ার জন্যে বই পড়াকে দেওয়া হয় প্রথমে জায়গা। বলা 'যদি তুমি হতে চাও বড়ো/ মন দিয়ে খাও খেলো পড়ো।'

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. 'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ',—এটি কার লেখা গানের অংশ? তাঁর জন্ম মৃত্যু কবে? কোথায় তাঁর জন্ম?

২. 'যে-মানুষ বাইরে যুক্তিপ্রিয় সে কেন অন্তরে ভক্তিবাদী হতে পারবে না?' একথা কে বলেছিলেন?

৩. 'বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনা রূপার নয়'— এ গানের লেখকের পিতার নাম?

৪. 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের একটি বিখ্যাত গানের শুরুটা কি?

৫. 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা।' এই গানের পরের লাইনটি কি?

উত্তর : ১. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৮৬৩-১৯১৩। কৃষ্ণনগর। ২. দিলীপকুমার রায়। ৩. দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। ৪. 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে'। ৫. 'রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ওই ডাকে ভারতমাতা'।

ছোটোদের বলছি

উল্টো পাল্টা

রামরতন বেশ কাজের মানুষ। তবে কাজের থেকে ফাঁকির দিকে মনোযোগ বেশি। মাঠে রোজ কাজ করতে যায়। মাঠ থেকে বাড়ি আসে চটপট। একদিন যদুনাথ বারিক জিগগেস করল, 'মাঠ থেকে বাড়ি যাও কখন?'

রামরতন বলল, 'ঠিক সাড়ে বারোটায়।'

যদুনাথের প্রশ্ন, 'কি করে বোঝ সাড়ে বারোটা? তোমার কাছে তো ঘড়ি নেই।'

রামরতন হেসে বলল, 'ঘড়ির কি দরকার!। পাশেই স্কুলে একটার সময় টিফিন হয়। ঘণ্টা বাজে। আমি আধঘণ্টা আগে মাঠ ছাড়ি। কোনওদিন ভুল হয় না।'

২

কানে কম শোনার ব্যাপারটা তপন করের ছোটোবেলা থেকে। অনেক জরুরি কথাই শুনতে পায় না। কেউ কেউ বলে, 'ইচ্ছে করে শুনতে চায় না।' অনেক সময় বউ বিরক্ত হয়। একটা জিনিস আনতে বললে ভুলে যায়, অন্য জিনিস আনে। বউ কখনও হাসে, কখনও রাগে।

তপন ছবি আঁকার শিক্ষক। একটি মেয়ে তার কাছে শিখতে আসে আঁকা। একদিন মেয়েটি

বলল, 'সব ছবি কি একইরকম কাগজে আঁকবো?' তপন জবাবে বলে, 'না, আমি এখন কোথাও যাচ্ছি না।'

মেয়েটি হাসি চাপল। তপনের বউ সব শুনে বলল, 'কালার মরণ, তবু যন্ত্র নেবে না!' তপনের মেয়ে জোরে জোরে বলে শিক্ষার্থী মেয়েটার প্রশ্ন জানাতে তপন এমন ভাব করল যেন কিছুই হয়নি। সে বলল, 'আমি সব শুনতে পাই। আমাকে এঁকে দেখাবে।'

রামগরুড় সংকলিত

ভারতবর্ষে পঞ্চায়েতে নারী

প্রীতি বসু

'পঞ্চায়েত নারী' সম্বন্ধে বলতে গেলে গ্রামীণসমাজ ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকাই উল্লেখনীয় হয়ে ওঠে। কারণ পূর্ব থেকেই শহরাঞ্চলে ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড পৌরসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে। সেগুলির কর্মসূচী গ্রামগুলি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোয় না। সেজন্য গ্রামগুলিতে 'পঞ্চায়েত' ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

স্বাধীন ভারতে পঞ্চাশ দশকের মধ্য ভাগ থেকে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হয়েছে। তার পর-পরই এখানে 'পঞ্চায়েত' ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলে বলা হয়েছিল--- যেহেতু রাজ্য সরকারের সংস্থাগুলির পক্ষে প্রতিটি গ্রামবাসীর কাছে পৃথকভাবে পৌঁছোনো সম্ভব নয়, সেজন্য এমন সংস্থা তৈরি করতে হবে যা প্রশাসনের সহযোগিতায় জনগণকে এক সাধারণ কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসবে। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যে ধারণা ছিল ভারতের গ্রামীণ সমাজ গতিহীন ও অপরিবর্তনীয়— তা মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ব্যবস্থাকে যথেষ্ট পরিবর্তনশীল করে গড়ে তুলেছে।

১৯৭৩ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে— পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। এই প্রক্রিয়ার ফলে পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংখ্যা ও গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। তাঁরা শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে যুক্ত হয়েছেন তাই নয়, উন্নয়ণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও মতামত দিতে পারছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুব একটা অংশগ্রহণ করতে পারেন তা নয়। কারণ সাংসারিক ও নানান দিক থেকে তাঁদের বাধাবিপত্তি ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তবে আশার কথা যে বর্তমানে মহিলারা পঞ্চায়েতে যথেষ্ট সংখ্যাতেই যোগদান করছেন ও কাজেকর্মেও অংশ গ্রহণ করছেন। তাই পঞ্চায়েতেও তাঁদের স্থান উচ্চতর হচ্ছে।

সাক্ষরতার বিভিন্ন অভিযান পঞ্চায়েতের একটি বিশেষ কম-সূচী। একাজে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে সমান-ভাবে কাজ করে চলেছে। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা ও অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলি মহিলারাই চালাচ্ছেন।

বিভিন্ন পর্যবেক্ষণকারী ও গবেষকরা নিরীক্ষণ করে দেখেছেন যে পঞ্চায়েতে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের কারণে নেতৃত্ব পাওয়ার ফলে পঞ্চায়েতে যে শুধুমাত্র বড়-বড় গণমান্য লোকেরাই অবস্থান করছেন তা নয়। বরং তাঁরাই দীপ্তিহীন হয়ে পড়েছেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ও মধ্যবিত্তস্তর থেকেই বহু মানুষ উঠে এসে পঞ্চায়েতে নেতৃত্ব দিতে পারছেন। যেমন, মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে— ভূমিহীন কৃষক, বর্গাদার, ক্ষেত মজুর, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি এক বিশেষ অধ্যায়। গ্রামীণ মহিলারা পঞ্চায়েত থেকে নানান সাহায্য পাচ্ছেন। পঞ্চায়েতে যুক্ত মহিলারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার কথা বলছেন। যেমন--- 'ঢোকরা' প্রকল্প। 'ঢোকরা' প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে বেশ কিছু মহিলা অল্পবিস্তর রোজগারও করছেন। এটি ছাড়াও পঞ্চায়েতের নেতৃমহিলারা গ্রামের মহিলাদের মুড়ি ভাজা, ধানচালের কাজ, হাঁস-মুরগী, গো-পালন, বাঁশ ও বেতের কাজ, নারকেলের দড়ি তৈরি, উলবোনা প্রভৃতি করে তাঁদের কিছু কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তাঁদের ঋণদানেরও ব্যবস্থা করছেন। বিভিন্নভাবেই মহিলা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ব্যবস্থা করে চলেছেন।

পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য বিধানের ব্যবস্থাকেও ব্যাপ্ত করার জন্য নেতৃ মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে চেষ্টা করে চলেছেন। আগে ঘরের মহিলারা পঞ্চায়েতের পরিবার পরিকল্পনা, শিশুদের স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ভাসা-ভাসা জানলেও কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা অজ্ঞতায় এগিয়ে আসতেন না, আজ অঙ্গনওয়াড়ী মহিলারা ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁদের ও বাড়িগুলির শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন, সমস্ত বিষয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ফলাফলে মহিলারা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার উপকার গ্রহণে এগিয়ে আসছেন। শিশুদের পোলিও খাওয়ানোর ব্যাপারেও নেতৃ মহিলারা যথেষ্ট এগিয়ে।

শিক্ষার ব্যাপারেও নেতৃ মহিলারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এসে শিক্ষা নেবার মন তৈরি করছেন।

মহিলারা মহিলাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে দেশের অর্থনীতির সঙ্গে তাঁরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। কিভাবে তাঁরা রোজগার করে বাবা স্বামী-দাদা বা অন্য অভিভাবকদের কিছু-কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন তার পথও দেখিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের রোজগার করবার জন্য পঞ্চায়েত থেকে ঋণ পাওয়ারও ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

গ্রামীণ সমাজের ও সর্বোপরি সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়নেও মহিলানেত্রীরা বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছেন। তাঁরা সমাজের সকলক্ষেত্রেই নজর দিচ্ছেন। যেমন— বাড়ি বাড়ি গিয়ে কম পয়সার শৌচাগার তৈরিও এই ব্যবস্থার উপকারিতা সম্পর্কে মহিলাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন, অল্প পয়সার ধূমহীন চুল্লী বসিয়ে দিচ্ছেন— এরকমই নানান ভাবে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছেন। তবে সবশেষে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সমীক্ষকরা সমীক্ষা করে দেখেছেন যে— আজও আমাদের দেশে পুরুষরা নারীদের এগিয়ে আসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। দেখা যাচ্ছে যে, অনেক স্বল্প শিক্ষিত গৃহস্থ মহিলা সাহস করে পঞ্চায়েতের কাজে তথা দেশের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আনতে চাইছেন, কিন্তু চিরাচরিত মনোভাবের জন্য স্বামী /শ্বশুর / শাশুড়ি /ননদ / দেওর বা সংসারের অন্য কোনও সদস্য— যেন মহিলা বাইরে বেরোলেই সংসারের— বংশের সম্ভ্রান্ততা ক্ষুণ্ণ হবে আশঙ্কায় পদে পদে তাঁদের আড়ালে তথা কর্তৃত্বের মধ্যে রেখে দেবার চেষ্টা করছেন। প্রত্যক্ষই দেখা গেছে— নেত্রী পঞ্চায়েত সভায় এসেছেন। তাঁর শ্বশুর বাইরে বসে আছেন, সভা শেষ হলেই বউমাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাবেন।

পরিবর্তনের জন্য চাই ভারতীয় মূল্যবোধভিত্তিক বিকল্প সংবাদমাধ্যম

অতিথি কলম

বৃজকিশোর কুঠিয়ালা

সম্প্রচার ও কমপিউটারের সংমিশ্রণে বর্তমানে যে আধুনিক গণমাধ্যমের উদ্ভব হয়েছে তার প্রভাব সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গণমাধ্যমের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতির ওপর সকলেই অসন্তুষ্ট। গণমাধ্যম অর্থাৎ মিডিয়ার ক্রিয়াকলাপ সমাজের ভালোর জন্য কিনা তা আজ অস্পষ্ট। শুধুমাত্র সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্নরাই নন, সংবাদপত্রের পাঠকরা, বৈদ্যুতিন মিডিয়ার দর্শক ও শ্রোতারাই নয়, সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও বর্তমান পরিস্থিতির ওপর অসন্তুষ্ট। সমাজের ভালো-মন্দের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব আজ বিশ্লেষণ করার আগে, মিডিয়া কি এবং সমাজে তার ভূমিকা কি তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রকৃতির সর্বশক্তিমান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ :

মানুষ গঠন করার সময় তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট ছকে বেঁধেছিল। আদিম মানবের শক্তি অন্যান্য বন্য প্রাণীর তুলনায় অনেক কম ছিল। সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে পারত না, বহন ক্ষমতা ছিল কম, হাতে বেশি জোর ছিল না, স্বর নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বেশি দূরে তার আওয়াজ পৌঁছোতে পারত না, তার শ্রবণ-ক্ষমতাও ছিল সীমিত। ঘ্রাণশক্তিও প্রখর ছিল না। এক কথায় অন্যান্য বন্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ ছিল দুর্বল। কিন্তু অন্যান্য পশুর তুলনায় মানুষের মস্তিষ্কের জন্যই মানুষ আজ হয়ে উঠেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান প্রাণী। মানব মস্তিষ্ক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে, তাকে সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারে। প্রকৃতির মতো সে জন্ম দিতে পারে নতুনের, সৃষ্টি করতে পারে নতুন জিনিস, প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করতে পারে আবার ধ্বংসও করতে পারে।

একারণেই হয়তো মানবতার ইতিহাস সৃষ্টির কথা বলে। নিজের ক্ষমতার সীমা ভঙ্গ করাই মানুষের মূল স্বভাব। কথিত আছে যে মানুষের প্রথম আবিষ্কার আগুন, কিন্তু এ বিষয় নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কারও মতে মানুষ সৃষ্টির হাজার হাজার বছর আগে আগুনের উদ্ভব হয়। আর মানুষ প্রথম সেই আগুনকেই নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। আগুন জ্বালানো, তার আঁচ বাড়ানো কমানো, তাকে সামলে রাখা, নেভানো ইত্যাদি। আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনা মানুষের কাছে ছিল প্রথম চ্যালেঞ্জ। যাকে বাগে পেতে বহু বছর তাকে নিজের মাথা খাটাতে হয়েছিল।

মানুষের কাছে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ছিল দূরকে কাছে আনা। তার ইচ্ছে ছিল পাহাড়ে ওঠার, নিজে ওঠাই নয় নিজের সঙ্গে সে বহন করতে চেয়েছিল তার প্রয়োজনীয় জিনিস। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সহজে যেতে চাইত সে। সেক্ষেত্রে তার পা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রধান অন্তরায়। বেশি সময় সে চলতে পারত না। তার এই সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ আবিষ্কার করল চাকা। চাকা আবিষ্কারের ফলে মানুষের দূরে যাওয়া হয়ে উঠল সহজ। এখনও পর্যন্ত মানব সভ্যতা চাকার ওপরই দণ্ডায়মান আছে।

গুহাজীবনে মানুষ আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করতে শিখল পাথর ও লাঠি। পাথর ও লাঠি ছিল মানুষের প্রথম অস্ত্র। খাদ্যের জন্য বনের মূল সংগ্রহ করার সময় হাত দিয়ে মূল তুলতে অসুবিধা হওয়ায় নিজের সুবিধার জন্য সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিখল পাথর। ধীরে ধীরে তৈরি করল সুতো, সেই সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করার জন্য বানাল চরকা। তাতে সন্তুষ্ট না থেকে আবিষ্কার করল কাপড় তৈরির মিল। ধাতু আবিষ্কার করে পাথরের পরিবর্তে বানাল ধাতুর অস্ত্র, তৈরি করল তীর, ঢাল, তলোয়ার, কামান এবং সবশেষে এল ক্ষেপণাস্ত্র অর্থাৎ মিসাইল। মানুষ তার সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠল উন্নত মস্তিষ্কের জোরেই।

মানুষেরই এই গল্পের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে মিডিয়া অর্থাৎ গণমাধ্যমের উদ্ভবের ইতিহাস। মানুষের কথা আদান প্রদান করার পরিধি ছিল ছোট। উপকরণ ছাড়া মানুষ শুধুমাত্র কাছের মানুষের সঙ্গেই কথা বলতে পারত। কিন্তু নিজের কথা দূরে পাঠানোর ইচ্ছে তার ছিল, তাই ব্যবহার করতেশিখল ভেঁপু, পরবর্তীতে মাইক্রোফোন ও লাউডস্পিকারের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের কাছে তার কথা পৌঁছে দিতে শিখল। মানুষ চাইল যে বহু দূরে থাকে তার সঙ্গে কথা বলতে। ফোন এবং রেডিওর আবিষ্কার তো মানুষের সেই উৎকণ্ঠার ফসল। এখন মাইক্রোফোন, টেলিফোন, মোবাইল ফোন মানুষের কথা বলার সীমিত শক্তিকে করে তুলেছে অসীম।

মানুষের দৃষ্টি প্রখর না হলেও তার ইচ্ছে আকাশ ছোঁয়া। মানুষের আকাঙ্ক্ষা অতীতে পৌঁছানোর। তাই সে বানিয়েছে ক্যামেরা, বানিয়েছে ভিডিও ক্যামেরা, তৈরি করেছে চলচ্চিত্র, তার চোখের সীমাকে করেছে অসীম।

গল্প এখানেই শেষ নয়। যে মস্তিষ্কের জোরে মানুষ এতসব সৃষ্টি করল তা ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে অচল। সংগ্রহ করার জন্য সূচনা ও জ্ঞানের অথৈ সমুদ্র তার সামনে ছিল। কিন্তু স্মরণ-শক্তি দিনের পরদিন ক্ষীণ হওয়ায় মানুষের সামনে তা এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। আবার কখনও কখনও সেই মস্তিষ্কও ধোঁকা দেয়। মস্তিষ্কের এই দুর্বলতার

সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য মানুষ আবিষ্কার করল কমপিউটার। এই আবিষ্কারের জোরেই আজ সারা বিশ্ব চলে এসেছে মানুষের হাতের মুঠোয়, সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার এই গণকযন্ত্র অর্থাৎ কমপিউটারের কাছে। মানুষের মাথার থেকেও একপা এগিয়ে রয়েছে এই কমপিউটার। মস্তিষ্ক কোনও কিছু করলে তা ভোলে না, কিন্তু কমপিউটারের ডিলিট বোতামের মাধ্যমে তাও করা যায়। মানুষের মস্তিষ্কের শক্তিশালী আবিষ্কার কমপিউটার।

কমপিউটার যুগের জন্ম :

আধুনিক যুগে চোখ রাখলে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ কমপিউটার কোনও তার ছাড়াই একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। তা রয়েছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এখন গণমাধ্যম হয়ে উঠেছে মানুষের সীমিত ক্ষমতার অসীম রূপ। দুর্ভাগ্যবশত মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতির ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে দুর্বলের ওপর অত্যাচারের প্রবৃত্তি। মানুষ তার ইতিহাসকে ভুলে আবিষ্কৃত হাতিয়ারের যেরূপ অপপ্রয়োগ করছে, সংবাদমাধ্যমেও অসৎ চিন্তাভাবনার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণমাধ্যম হলো সমাজের দর্পণ। এই দর্পণের দুটো ভাগ রয়েছে— উতল ও অবতল। দর্পণে প্রথমে অনেকগুলি ছোট ছোট প্রতিবিম্ব হয়, তারপর তা বড়ো আকারে দেখা যায়। মিডিয়াও ঠিক সেরকম। বহু ক্ষেত্রে মিডিয়া লেন্সের ভূমিকা পালন করে। কোনও একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে ধোঁয়া বা আগুন উৎপন্ন করে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

নিজের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত প্রায় মিডিয়া :

মানুষের মনের লোভ মিডিয়াকে নিজের বক্তব্য থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। এর ফলে সংবাদ তার বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে। সংবাদপত্র এখন হয়ে উঠেছে এক লাভজনক ব্যবসা। সংবাদপত্রের অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজ্ঞাপনভিত্তিক। পাঠকদের থেকে সংবাদপত্রের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সংবাদদাতারা। সংবাদপত্র হয়ে উঠছে ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ্‌দের সহযোগী, একান্ত আপন বন্ধু, যার ফলে সমাজকে দিক্‌ভ্রান্ত করার জন্য গণমাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে সিদ্ধহস্ত। ভারতে এর প্রভাব কিছু কম নয়।

মোবাইল আর ইন্টারনেটের বিস্তারের ফলে সংবাদ আদান প্রদান করা হয়ে উঠেছে সহজ। সারা বিশ্বে ইন্টারনেট ও মোবাইলের সাহায্যে মানব সমাজে যে ভৌতিক জাল বোনা হচ্ছে, তা সৎ কাজের জন্য এবং মানবসমাজের কল্যাণের জন্য করা দরকার। কিন্তু একে অপদেবতার দৃষ্টির বাইরে রাখা সহজ নয়। আজ সারা বিশ্বের কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে পশ্চিমী সংস্কৃতির আধারে। বর্তমান পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমি বাণিজ্যিক সংসারের মতো। গণমাধ্যমকে বাণিজ্যভিত্তিক করার বিকল্পপথ অনুসন্ধান করা দরকার। যা মানুষের কাছে কঠিন নয়। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে গণমাধ্যমের উৎস ও কার্যপ্রণালীর তাই বিকল্প দর্শন এবং সিদ্ধান্ত পাওয়া অসম্ভব নয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে গণমাধ্যমের দৃষ্টিকোণ, উদ্দেশ্য, স্পিরিট এবং ভূমিকার খোঁজ করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে মানব জীবন :

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ উপনিষদ পুরাণ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সাহিত্য পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রন্থে সত্যের অনুসন্ধানকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানব জীবনের উদ্দেশ্যই সত্যের খোঁজ করা। আর তার প্রতিপালন করা। এক কথায় বলা যেতে পারে— সত্যং বদ, ধর্মং চর। তাই প্রত্যেক সংবাদেই সত্যের আধারই শ্রেষ্ঠ। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড় দৃষ্টিকোণ।

মানব সমাজের জন্য সাংবাদিকতা এবং সংবাদ-মাধ্যম অনিবার্য কেন? তা কেবল ভুল অনুসন্ধানের কাজ নয়, সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন করা নয়, প্রকৃত অর্থে গণমাধ্যমের কাজ সমাজের মধ্যে সমন্বয় রাখার চেষ্টা করা। গণমাধ্যম এক ক্ষেত্রের সঙ্গে আরেক ক্ষেত্রের সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম সেতু। তার কাজ শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে সহায়তা করা। একাত্মতামন্ত্রের শিক্ষা তো এটাই, ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমগ্র বিশ্বকে এক করার মনোভাব প্রস্ফুটিত হয়।

বসুধৈব কুটুম্বকম্ :

সারা বিশ্ব একটা পরিবার। সারা বিশ্বে একাত্মতা সৃষ্টি করা সাংবাদিকদের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের সাধনার যে ফল মানব সমাজকে দিয়েছেন, তার সৎ ব্যবহার করা প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল মন্ত্র বিবিধতা এবং একতা। এই বিবিধতাই বিকাশের পুঁজি। বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেন, এই বিবিধতার জন্যই জাতির সৃষ্টি হয়।

একম্ সদ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি :

অন্তিম সত্যতো একই। কিন্তু জ্ঞানী ব্যাক্তিরা নিজের মতো করে নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করেন। সাংবাদিকতা হলো সত্যের খোঁজ আর প্রাপ্ত সত্যের দ্বারা সমাজকে গঠন করার কাজ। সত্যকে হারিয়ে কখনও সত্যের পালন করা যায় না। অপুষ্ট সংবাদকে 'ব্রেকিং নিউজ' করা আর অস্পষ্ট সত্য বা অসত্যকে সংবাদের আকারে জনসম্মুখে আনা সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হতে পারে না।

সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলে বলা যেতে পারে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা সমাজে স্বীকৃত হতে হবে। তাই সমাজের প্রত্যেক স্তরে সামাজিক সংবাদ এবং আলোচনার প্রয়োজন। জনসাধারণের সম্মতিতে উচিত অনুচিত নির্ণয় করা দরকার। সমাজের উপযোগী কাজের জন্য সংবাদমাধ্যমকে উপযুক্ত মঞ্চ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। মহাত্মা গান্ধী গণমাধ্যমের যৌথ মালিকানাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। বেদে বলা হয়েছে—

আ নো ভদ্রাঃ কর্তব্য সন্তু বিশ্বত :

যুক্তি বা ভালো বিচারের দরজা সবসময় আমাদের কাছে খোলা। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, তিনি নিজের মন ও মস্তিষ্কের জানালা সতেজ হাওয়ার (সৎ বিচারের বা ভালো বিচারের) জন্য খোলা রাখেন। কিন্তু সেই ফল যাতে নিজের মাটির গাছে হয় সেদিকে নজর রাখা দরকার। গণমাধ্যমের ভূমিকা বিচার আর আলোচনার উত্তম মঞ্চ হিসেবে গঠিত হলে একটি সুন্দর বিকল্প ভারতীয় চিন্তাধারার গণমাধ্যম পাওয়া যাবে।

ভারতীয় মনীষীদের জীবনী আলোচনা করলে সাংবাদিকতার সীমাবদ্ধতা দেখা যায়।

নারদ তার ভক্তিসূত্রে বলেছেন, 'সত্য তো এটাই, কিন্তু শব্দে একে ব্যক্ত করা যায় না'। সাংবাদিকতায় শব্দ ও চিত্রের মাধ্যমে সম্প্রচারের দুর্বলতার অনুভূতি হওয়া দরকার। ভক্তি সূত্রে বলা হয়েছে, সত্যের এই ঘোষণা তো পরিণাম-ক্রিয়া নয়। সেরকম সাংবাদিকতা ও সমাজে সমন্বয় সাধন করা। কিন্তু একাজে কৃতিত্বের অহঙ্কারের ফলেই মনে বিকৃতির উদ্ভব হয়। সত্যের খোঁজ গণমাধ্যমের প্রধান কাজ। কিন্তু কোনও কোনও সত্যের ক্ষেত্রে বিরত থাকাও মাঝে মধ্যে প্রয়োজন। অপ্রিয় সত্য দুঃখের কারণ হয়ে বহু ক্ষেত্রে তা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। এরূপ সংবাদ করা বা সে সম্পর্কে আলোচনা করা সাংবাদিকতার ধর্ম বা আলোচ্য বিষয় নয়। শাস্ত্রে আছে—

সত্যং ব্রুয়াত প্রিয়ং ব্রুয়াত সত্য অপ্রিয়ম,
প্রিয়ংচ ননরাত্তম ব্রয়াত ইশধর্ম সনাতন :

সত্যই ধর্ম। তাই সত্য বলা উচিত। এরূপ সত্যবলা উচিত যা উল্লাস সৃষ্টিকারক হয়। অপ্রিয় সত্য সম্প্রচারে বাধা দেওয়া উচিত। অসত্য কখনও বলা উচিত নয়, কারণ তা মায়া বা ছলনাও হতে পারে। সাংবাদিকদের সত্য প্রকাশে সচেষ্ট হতে হবে। নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেছেন, যদি শাস্ত্রের প্রত্যেকটি নিয়ম ঠিকমতো পালন করা হয় তো পৃথিবী হয়ে উঠবে স্বর্গ। আর অসহায় নিপীড়িত মানুষ খুশিতে নাচবে। প্রত্যেক ভারতীয় দৈনন্দিন কাজকর্মে এই মন্ত্র জপ করে—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া,
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেত।

সারা বিশ্বে আজ ঢেউ উঠেছে প্রত্যেক বিষয়ে বিকল্প দৃষ্টিকোণ খোঁজার। আর সেই খোঁজে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের চিন্তাধারাই বর্তমানে সফল হচ্ছে। জীবন দর্শন হোক বা স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু, প্রকৃতির জীব, নির্জীব সকলের মধ্যে চেতনা, সবকিছুতে ভারতীয় চিন্তাধারা সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করছে। বহু পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমের চিন্তা নিজের সৃষ্টির অসম্পূর্ণতায় এখন ব্যাকুল। তার সামনে যখন গণমাধ্যম আর সাংবাদিকতাকে সামাজিক সংবাদরূপে উপস্থাপিত করা হবে তখনই সার্থক বিকল্প হয়ে ওঠে সহজবোধ্য। বিকল্প সংবাদ-মাধ্যম যদি আমরা নির্মাণ করতে পারি তবে শুধু ভারতবর্ষই নয়, সারা বিশ্বের কাছে এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে।

(লেখক ভূপালের মাখনলাল চতুর্বেদী রাষ্ট্রীয় পত্রকারিতা ও সঞ্চার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)

স্বস্তিকা পড়ুন, গ্রাহক হোন
অন্যকে গ্রাহক করুন
বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য
৩২৫ টাকা

Sharada Travels
ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী
শারদা ট্রাভেলস্
উলুবেড়িয়া, হাওড়া
প্রত্যুষ মণ্ডল– 9874398337 / 8820329463
❁ গ্যাংটক-নামচি-পেলিং-ইয়ুমথাং ❁ দার্জিলিং ❁ পুরী
❁ সিমলা-কুলু-মানালী ❁ কাশ্মীর ❁ ভাইজ্যাক-আরাকু
❁ দিল্লি-আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন-হরিদ্বার-মুসৌরী
❁ কেরালা ❁ গোয়া ❁ মুম্বাই ❁ আন্দামান
❁ দেওঘর ❁ সুন্দরবন ❁ সিমলীপাল
❁ শিলং-চেরাপুঞ্জি-গৌহাটি
প্যাকেজ ট্যুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

পাক সীমান্তে মাছিটাও চোখে পড়ছে আর বাংলাদেশ সীমান্তে হাতিও নজরে আসে না কেন?

সাধন কুমার পাল

সমস্ত দেশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গও সাক্ষী হয়ে রইল অভূতপূর্ব সীমাদর্শনের কার্যক্রমের। উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা। প্রত্যেকটি জেলার সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। এছাড়াও রয়েছে ভূটান ও নেপাল সীমান্ত। উত্তরবঙ্গে মোট ১২টি আধার শিবিরে (বেস ক্যাম্প) সমস্ত দেশ থেকে ৬১১ জন যুবক এই সীমা দর্শনের কার্যক্রমে যোগ দিতে এসেছিল। আধার শিবির (বেস ক্যাম্প) বলতে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা কেন্দ্রগুলিতে দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সীমা দর্শনের কার্যক্রমে যোগ দিতে আসা যুবকদের সীমান্তে যাওয়ার আগে সাময়িক বিরতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেগুলিকেই বোঝানো হচ্ছে। সেখানে সীমান্তের খুঁটিনাটি, স্থানীয় ভাষায় দু-চারটি প্রশ্ন উত্তর, করণীয় ও করণীয় নয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ হয়। এরপর বিভিন্ন প্রদেশের একজন বা দুজন করে নিয়ে ১০/১৫/২০ জনের এক একটি দল তৈরি করা হয়। বহু ভাষাভাষী সমন্বয়ে তৈরি এক একটি দল যেন একটি ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ।

আধার শিবিরে প্রশিক্ষণ শেষে গত ২০ নভেম্বর প্রায় সমস্ত দলই পৌঁছে গিয়েছিল স্থানীয় ভাবে পূর্বনির্ধারিত সীমা চৌকিগুলিতে। বাংলাদেশ/নেপাল/ভুটান সীমান্ত বরাবর গড়ে ২০ কিমি দৈর্ঘ্য ছিল এক একটি সীমা চৌকির। সেখানেও সীমান্তের প্রকৃত বাসিন্দারাই সীমা দর্শনে যাওয়া প্রত্যেকের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে। সীমা চৌকিগুলিতে প্রায় প্রত্যেকটি দলকেই স্থানীয়ভাবে নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, ফুলের মালা, পুষ্প স্তবকের মাধ্যমে স্বাগত জানানো ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে এই নতুন অতিথিদের সংবর্ধনার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল বৈরাতী নৃত্যের। অরণ-বরণ চাইলন খান অল্প বয়সের... এ বাড়ি হইতে ওবাড়ি যাইতে ঘাটায় ছিপ ছিপ পানি... ইত্যাদি গানের সুরে দোতারা, ঢোলকের তালে তালে, চালুন, কুলো, প্রদীপ ধান-দূর্বা, সিঁদুর হাতে নেচে গেয়ে স্থানীয় মা-বোনেরা বরণ করে নিল এই ভিনদেশী অতিথিদের। যেন কতযুগের আত্মীয়তা, কত আপন জন! দলের কেউ তামিলনাড়ুর কেউ কেরলের, কর্ণাটকের আবার কেউবা রাজস্থানের মতো ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের। কেউ কারও ভাষা বোঝে না। তেরঙ্গা হাতে এই সমস্ত দল যখন সীমান্ত ভ্রমণ করছিল সে সময় 'আমরা এক জাতি এক প্রাণ' এই আবেগের স্রোত পরস্পরের ভাষা না বুঝতে পারার মতো বাধাকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে এমন এক আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া যা আন্দাজ করা একটু অসম্ভবই।

সীমা চৌকিগুলিতে কোথাও একত্র ভোজন / শয়নের ব্যবস্থা হলেও অনেক জায়গাতেই বাড়ি বাড়ি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কোনও কোনও জায়গায় এতটাই উচ্চে উঠেছিল যে ওরা কোথায় ঘুমোবে, কার বাড়িতে খাবে, কি খাবে এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। অবশ্য ওরা কেউ খালি হাতে আসেনি। সবাই নিজ নিজ এলাকার জল / মাটি সঙ্গে করে এনে উপহার হিসেবে দিয়েছে উত্তরবঙ্গের সীমান্তবাসীদের। অনেকেই জাতীয় ঐক্যের প্রতীকি আচরণ হিসেবে নিজ নিজ প্রদেশের মাটি / জল ছিটিয়ে দিয়ে গেছে কাঁটাতারের বেড়া লাগোয়া সীমান্ত এলাকায়।

ওরা স্থানীয় আতিথেয়তায় আপ্লুত হয়ে সীমান্ত দেখে ফিরে গেছে তা নয়। সীমান্ত বাসিন্দাদের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার কথা শুনেছে আন্তরিকভাবে। স্থানীয় বাসিন্দারা মন খুলে ওদের কাছে সীমান্তে বসবাসের নানা অসুবিধা তুলে ধরেছে। ওরা স্থানীয় মানুষদের কথা দিয়ে গেছে— সীমান্তে রাস্তাঘাট নেই, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যাদের জমি আছে তারা যে নানা বিধিনিষেদের কারণে ঠিকমত চাষবাস করতে পারে না, চাষ করলেও বাংলাদেশের চোরেরা ফসল কেটে নিয়ে যায়, অবর্ণনীয় দারিদ্র্য বেকারি যে সীমান্তবাসীর নিত্যসঙ্গী এই সমস্ত কথা সারা দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে। কারণ সীমান্ত মানে শুধুমাত্র কাঁটাতারের বেড়া আর বন্দুকধারী বি এস এফ-এর প্রহরা নয়। সীমান্তের স্থায়ী বাসিন্দারাও সীমান্ত সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ সীমান্তের বাসিন্দাদের দুঃখ দুর্দশার মধ্যে রেখে সুরক্ষিত সীমান্ত কখনই সম্ভব নয়।

২১-২২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গের সীমান্তে থেকে থেকে স্লোগান উঠেছে। যেমন সরহদ তুঝে প্রণাম, ভারতমাতা কী জয়, বন্দেমাতরম, হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ। স্লোগানে গলা মিলিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারাও। এই স্লোগানে বিগলিত হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অতন্ত্র প্রহরায় দাঁড়িয়ে থাকা বি এস এফ জওয়ানদের হৃদয়ও। বন্দুক পিঠের দিকে ঝুলিয়ে কোলাকুলির ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরেছে সীমা দেখতে আসা আগন্তুক যুবকদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতো ওরাও মন খুলে তুলে ধরেছে ওদের নানা সমস্যার কথা। ২২ নভেম্বর সকাল ১১টায় ছিল দেশের সমস্ত স্থলসীমা জুড়ে মানব শৃঙ্খল তৈরির কার্যক্রম। উত্তরবঙ্গে এই মানবশৃঙ্খলে সামিল হয়েছিল

অসংখ্য স্থানীয় মানুষ। ফোরাম ফর ইন্টিগ্রেটেট ন্যাশনাল সিকিউরিটি (FINS) আয়োজিত এই অভিনব সীমা দর্শনের কার্যক্রমের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছে সীমান্তের বাসিন্দারা। কারণ ২১-২২ নভেম্বর আগে পরে কমপক্ষে ৭ থেকে ১০ দিন সীমান্ত দিনে সমস্তরকম অবৈধ ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ ছিল। এই ঘটনা থেকে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে বি এস এফ সবাই এক যোগে সীমা দর্শনে আসা FINS এর প্রতিনিধি দলকে বলেছে 'আপনারা মাঝে মাঝে এরকম প্রোগ্রাম করুন তা হলে সীমান্ত দিয়ে চোরাকারবার, গোরু পাচার, অনুপ্রবেশ বন্ধের মতো দুরূহ কাজটি সহজেই সফল করে ফেলা যাবে।'

দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৬১১ প্রতিনিধি যেমন উত্তরবঙ্গে এসেছে, ঠিক তেমনি উত্তরবঙ্গ থেকেও ৩১ জন প্রতিনিধি দেশের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়েছিল। যেমন, কোচবিহার থেকে পাঁচজন পিলভিটে নেপাল সীমান্তে, শিলিগুড়ি থেকে সাতজন পাঞ্জাবে পাকিস্তান সীমান্তে, দুই দিনাজপুরের দশজন জম্মু-কাশ্মীর পারিস্তান সীমান্তে এবং মালদহ থেকে নয়জন রাজস্থানে পাকিস্তান সীমান্তে গিয়েছিল। উত্তরবঙ্গ থেকে দেশের পশ্চিম সীমা পরিদর্শনে যাওয়া প্রতিনিধিদল নিজের এলাকায় ফিরে এসে যে প্রশ্নটি তুলেছে তা হলো—

পাকিস্তানের সঙ্গে দেশের পশ্চিম সীমান্ত এতটাই সুরক্ষিত যে কোনও কাকপক্ষীর পক্ষেও যেন সীমান্ত দিয়ে গলে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। অথচ পূর্বে বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তের সবটুকু আজ পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়া, বি এস এফ চৌকি সমস্ত কিছুই থাকা সত্ত্বেও খোলা মাঠের মতো অবাধ। নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্র থেকে শুরু করে গোরু যেমন পাচার হচ্ছে তেমনি এদেশে ঢুকছে অনুপ্রবেশকারী, সন্ত্রাসবাদী মারণাস্ত্র, জাল নোট। সদিচ্ছা থাকলে যে সীমান্ত সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখা যায় দেশের পশ্চিম সীমান্ত তার প্রমাণ। তাহলে সরকার পশ্চিম সীমান্ত সিল করে দিয়ে পূর্ব সীমান্ত খুলে রেখেছে কেন? বিদেশি সন্ত্রাসবাদী, মারণাস্ত্র এই পূর্ব সীমান্ত দিয়েই দেশে প্রবেশ করছে, এই সংক্রান্ত প্রমাণিত তথ্য থাকা সত্ত্বেও সরকার সচেতন হচ্ছে না কেন?

কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ধুমধাম করে। স্বাভাবিক নিয়মে তার শেষের ঘণ্টাও বাজল। ওয়াকিবহাল মহলের মতে দেশ জুড়ে সীমা দর্শনের এই কার্যক্রমের আসল উদ্দেশ্য হলো দেশের আত্মকেন্দ্রিক যুব সমাজকে দেশের সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা দেওয়া ও কেরিয়ার গড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ রক্ষায় ওদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। ওয়াকিবহাল মহল এও মনে করছে, সীমাদর্শনের এই কার্যক্রম আসলে দেশের স্থলসীমার সুরক্ষা ও অখণ্ডতা রক্ষায় এক বৃহত্তর আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করল। সীমাদর্শনে আসা এই ক্ষণিকের অতিথিদের বিদায়বেলায় অশ্রুসজল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল অনেক জায়গাতেই। বিদায়বেলায় উত্তরবঙ্গের সীমান্তের বাতাসে যেন ওই মুহূর্তে গুঞ্জরিত হচ্ছিল সেই বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান 'তোমরা গেইলে কি আসিবেন ওহ মোর প্রাণের বন্ধুরে...!'

বিবেকানন্দ
যুব শিবির : ২০১৩

বিবেকানন্দ যুব শিবির - ২০১৩

অংশগ্রহণের বয়স ১৫ থেকে ৪০ পর্যন্ত

১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৩

স্থান : গয়েশপুর, কল্যাণী, নদীয়া

সৌজন্যে—

আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের অভিজ্ঞতায়

স্বদেশীর পথে স্বদেশে ফেরা

লেভিন অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

(স্বদেশী চিন্তন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ)

ক্লাউনীয় চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শিশু চিকিৎসার ইতিহাসে এ কাহিনী চিরকাল লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। চণ্ডীগড়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব্ মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড

রিসার্চ (পি জি আই এম ই আর)-এর অ্যাডভান্স পেডিয়াট্রিক সেন্টার যে কাণ্ডটি ঘটিয়েছে তা নিঃসন্দেহে অভিনব। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে যে ডাক্তাররা চিকিৎসা করেন তাঁদের নামের পাশে ডিগ্রী বড় কম নেই। মানে এই নামী চিকিৎসা- প্রতিষ্ঠানের ডাক্তাররাও রীতিমতো নামী। আর নামী বলেই মানী। কিন্তু মিস্টার হা হা হা আর মিস হি হি হি টিমের সদস্যরাই যে এখানকার ডাক্তার মোটেও বিশ্বাস হয় না। হা হা হা আর হি হি হি জিনিসটা বুঝতে পারলেন না তো? ছোট্ট করে বুঝিয়ে দিই। হা হা হা হলো পুরুষ সঙের দল এবং হি হি হি হলো নারী সঙের দল। সার্কাসের জোকার আর কী! তবে পেটের দায়ে এঁরা ক্লাউন সাজেন না। বরং 'মানী'র মানসিক দূরত্ব নিঃসংকোচে মুছে ফেলে চণ্ডীগড় পি জি আই এম ই আর-এর ডাক্তাররা ক্লাউন সেজেই মাতিয়ে রেখেছেন ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের। যে শিশুগুলো কিন্তু আমার-আপনার মতো স্বাভাবিক শৈশব পায়নি। কেউ ভুগছে ক্যানসারে, কেউ বা কুষ্ঠ, কেউ আবার নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার, আবার কেউ বা ট্রমা কিংবা যকৃতের গণ্ডগোলে জেরবার। এখানকার ডাক্তাররা মনে করেন 'ক্লাউন ডক্টর'দের সঙ্গে কথা বলতে শিশুরা মজা পায়। আর মজা পায় বলেই তাদের সমস্যার কথা মনখুলে বলতে পারে। ফলে ডায়াগনোসিস এবং চিকিৎসার পথ সুগম হয়। তবে শুধু এখানকার ডাক্তাররাই নন, নার্সেরাও ক্লাউন সাজেন আর বলাই বাহুল্য হি হি হি দলের সদস্যা হয়ে যান।

কিন্তু দিনের পর দিন এই ক্লাউন সাজাটা কি বিরক্তির নয়? পি জি আই এম ই আর-এর ডাক্তাররা বলছেন, শিশু চিকিৎসায় এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব। বিরক্তি তো দূরের কথা। শিশু চিকিৎসার এহেন নয়া পন্থা উদ্ভাবন করায় বরং তাঁদের গর্বই হয়। সমস্যার কথাটা ঠিকভাবে ব্যক্ত করলেই সেই দুধের শিশুগুলো পেয়ে যাচ্ছে টপাটপ বিভিন্ন প্রাইজ। যেমন মিকি মাউস বা অন্য কোনও পুতুল কিংবা খেলনা। ফলে ডক্টর ক্লাউনরা হলো গিয়ে তাদের মনের মানুষ কিংবা প্রাণের বন্ধুও বলতে পারেন। এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট রাখতে ডাক্তাররা যেমন সচেষ্ট যাতে খেলনা কিংবা পুতুলের ভাঁড়ারে টান না পড়ে, অন্যদিকে খেলনা ও পুতুলের টানেই এই বন্ধুত্বের সম্পর্কে কচিকাঁচাগুলোও সমান আগ্রহী! দু'পক্ষের এই 'আগ্রহে'র কারণে শিশু চিকিৎসাশাস্ত্রেও উদ্ভাবন হয়েছে নতুন প্রণালীর।

কিন্তু একটা দুর্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এই বাহিকে পদ্ধতিতে যে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত শিশুটি সাড়া দেবে এমন নিশ্চয়তা কিন্তু ডাক্তাররা কেউই দিতে পারছেন না। তবে তাঁরা বলছেন, শিশুদের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা মনস্তাত্বিক। আজন্ম ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় স্বাভাবিক বোধ বুদ্ধিতে যেটুকু সমস্যা তারা ব্যক্ত করতে পারে, অনেক সময় চিকিৎসকের জেরায় সেটুকুও বলতে তারা অপারগ হয়। কিন্তু ডাক্তারদের ক্লাউনগিরিতে শিশুরা যে আপাতত মন খুলছে তাতেই সাড়া মিলছে চিকিৎসায়। আর তাতেই খুশি চিকিৎসকরা।

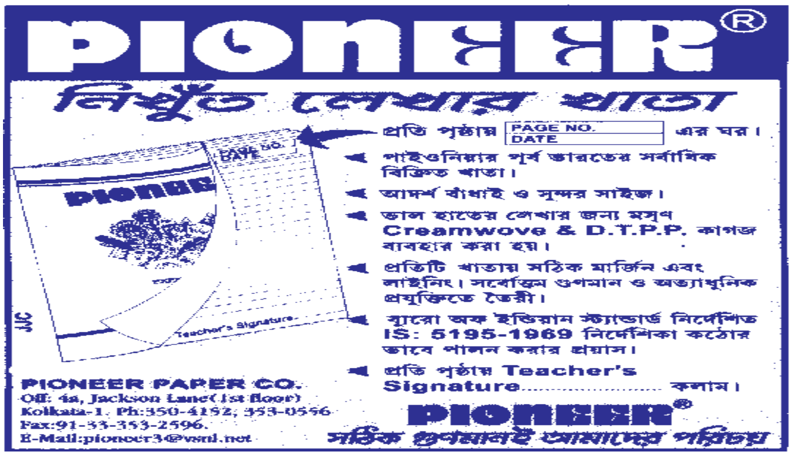

নির্মলদার দেবোপম হাসি বারবার মনে পড়ছে

শক্তিপদ পাল ॥ নির্মলদা চলে গেলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ কার্যকতা নির্মল চন্দ্র দাস গত ১১ নভেম্বর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র এবং এক কন্যা বর্তমান। দুই পুত্রই সঙ্ঘের কার্যকর্তা। ৭০-এর দশকের শেষে তিনি ৫ বৎসর সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন।

বাণীপুরে ফিজিকেল ট্রেনিং নিতে গেছিলাম ১৯৬৬-তে। পরিচয় হলো কাঁথির মলয় মুখার্জির সঙ্গে। ওর মাধ্যমে আমার পরিচয় হলো আর এস এস-এর। ১৯৬৭ সালে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে এপ্রিল-এ ফিরে এসেই শুরু করলাম তাজপুর গ্রামে আর এস এস-এর শাখা। শাখার প্রথমের দিকেই বাঁকুড়া থেকে নির্মল চন্দ্র দাস প্রচারক হিসাবে এলেন। থাকার জায়গা অর্থাৎ 'নিবাস' হিসাবে বেছে নেওয়া হলো কামারপুকুর হাটতলার সন্নিকটে একটি মাটির বাড়ি। আমি যখনই কামারপুকুরে আসি— নির্মলদার সঙ্গে দেখা করার জন্য নিবাসে হাজির হয়ে দেখি অপূর্ব সুন্দর করে সাজানো গোছানো চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাশেই ঝোপঝাড় কিন্তু কী সুন্দর করে ছাঁটা একটা আশ্রমিক পরিবেশ। তাজপুরে শাখায় উপস্থিত হলে দেখতাম তাঁর সময়ানুবর্তিতা। আরও ভালো লাগত তাঁর অপূর্ব মিষ্টি ব্যবহার। কারও সঙ্গে দেখা হলেই তার মুখে দেখতাম অপূর্ব দেবোপম হাসি। আমাদের বাড়ির সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যে— উনি আমাদের বাড়ির যেন একজন বিশেষ সদস্য। দেখেছিলাম আমার অনুপস্থিতিতেও কামারপুকুর বাজার থেকে টুকিটাকি জিনিস প্রয়োজন হলে নির্মলদা এনে দিত। আমার মা-জেঠিমা— আমার স্ত্রীর কাছে উনি ছিলেন এক বিশ্বস্ত আপনজন। পরবর্তীকালে যখন বাঁকুড়ার বাড়িতে ফিরে গিয়ে গৃহীর জীবন যাপন করেছেন— তখনও আমি তাঁর বাড়িতে গেছি। পেয়েছি অকুণ্ঠ আতিথেয়তা— অপূর্ব মিষ্টি ব্যবহার। আর সেই সময়ানুবর্তিতা-পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা— সব মিলিয়ে এক নিপাট ভদ্রলোক। সেই অমায়িক মানুষটি হঠাৎ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন— কোন্ সুদূর পারে। জানি সকলকেই সেই রাজ্যে যেতে হবে তবু মন যে মানে না। যখনই ভাবি— সেই নির্মলদাকে আর কোনওদিন দেখতে পাব না— তখনই ব্যথায় হৃদয় টনটন করে ওঠে। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি— তাঁর জন্মান্তরে জীবন যেন মধুময় হয়।

বিজয় আঢ্য ॥ নির্মলদার সঙ্গে বন্ধুত্ব অনেকদিনের। সেই ১৯৭১ থেকে যখন তিনি সঙ্ঘের কাজে কামারপুকুরে প্রচারক হিসাবে ছিলেন। এমন মৃদুভাষী সদাস্মিত মানুষ খুব কম দেখেছি। সহজ সরল ব্যবহার ও কর্তব্যপরায়ণতার জোরে সকলকে আপন করে নেওয়া ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। এইসব গুণবত্তার কারণে তাঁকে যখন নদীয়া জেলার প্রচারক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হলো, তারই অব্যবহিত পরে ১৯৭৫-এ দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলো। এরই প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয় তাতে অংশগ্রহণ করে তিনি কারাবরণ করেন এবং হুগলী জেলে অন্তরীণ ছিলেন। এই সময়ই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হন। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের পর তিনি আমৃত্যু সঙ্ঘের কোনও না কোনও দায়িত্বভার বহন করে গেছেন। কয়েক বছর আগে তাঁর বাঁকুড়ার বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেটাই যে শেষ দেখা তখন কে জানত! শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

ছিটমহলবাসীদের দাবি— সরকার শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নিক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চল আছে যেখানকার বাসিন্দারা কোন্ দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন— এই দোটানার মাঝখানে রয়েছেন। এ ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে টালবাহানা চলছে। নিয়মকানুনের বাঁধনে এই ছিটমহলের বাসিন্দাদের জীবন এক অনিশ্চয়তায় ভরা। প্রায় ৫০ হাজার মানুষ ছিটমহলে রয়েছেন। তারা জীবনযাপনের অনেক প্রাথমিক উপকরণ থেকে বঞ্চিত। তাঁদের বসবাসের জমি নিয়ে বিতর্ক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চলেছে বহু বছর ধরে। কিন্তু সমাধানের সূত্র এখনও মেলেনি। এই টালবাহানা বা ত্রিশঙ্কু দশা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে তারা কদিন আগে কলকাতা ও দিল্লীতে ধরনায় বসেছিলেন। তাদের দাবি ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিক সরকার। কেননা সে সময়ই সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হবে।

২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ হাসিনা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন ছিটমহলের বাসিন্দাদের দুই রাষ্ট্র বিনিময় করবে— এই ব্যাপারে। কিন্তু ভারতের সংসদ তা অনুমোদন করেননি।

ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির সচিব দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বলেছেন, আমরা অপেক্ষা করছি কয়েক দশক ধরে যথাযথ পরিচিতি পাওয়ার জন্যে। কিন্তু তা মিলছে না। তিন দশক হয়ে গেল ছিটমহল হস্তান্তরের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে; কিন্তু এখনও কার্যকর হয়নি। প্রতিদিনই ছিটমহলবাসীরা টেলিভিশনে লক্ষ্য রাখেন কোনদিন সংসদ ঘোষণা করবে সিদ্ধান্ত। কিন্তু আশা পূরণ হয় না। তবে একটা সরকারি কাজ হয়েছে। সেটা আদমসুমারি বা লোকগণনার। এরকম গণনার পর দেখা যায় যে ২০ হাজার মানুষ বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলে রয়েছেন তারা ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি।

আবার ১১১টি ভারতীয় ছিটমহলে যে ৩১ হাজার বাংলাদেশী আছেন তাঁরাও নাগরিকত্ব পাননি। কোচবিহারের ফরোয়ার্ডব্লক নেতা নৃপেন রায় বলেছেন, আমরা এ বিষয়ে সংসদে বিল আনার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। কিন্তু কতদূর কি হবে বলা কঠিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছিটমহলে বিনিময়ের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। কেননা তাতে রাজ্যের ১০ হাজার একরের বেশি জমি বাংলা দেশে চলে যাবে। রাজ্যকে পুনর্বাসন দিতে হবে ছিটমহলের বাসিন্দাদের। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক এখন তিক্ত হওয়ায় ছিটমহলে বিনিময়ের ব্যাপারটা রূপ দিতে দেরি হচ্ছে বলে রাজ্য সরকারের এক প্রবীণ আধিকারিক জানিয়েছেন।

মালদায় বাল্যবিবাহ রোধে প্রশাসন নীরব

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ মালদা সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে শিশু মৃত্যু এখন সংবাদ শিরোনামে প্রায় চলে আসছে। কিন্তু এই শিশু মৃত্যুর জন্য যারা ডাক্তার ও হাসপাতালের পরিষেবাকে দায়ী করছে তাদের জানা দরকার বেশির ভাগ শিশুই অপুষ্টি, কম ওজন এবং ১৮ বছরের নীচে মায়েদের গর্ভস্থ সন্তান। মালদা জেলায় গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীতে পাঠরতা ছাত্রীদের ৬০ শতাংশের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, যাদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু ও দরিদ্র পরিবারের। ফলে কম বয়সে সন্তান রুগ্ন এবং অপুষ্টিতে ভোগে ও বেশির ভাগই পৃথিবীর আলো দেখার আগেই হারিয়ে যাচ্ছে। জেলা প্রশাসন বাল্যবিবাহ রোধে মুখে বড় বড় কথা বললেও তেমন কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে সমীক্ষা চালালেই দেখা যাবে ছাত্রীদের মাঝপথেই বিয়ে হয়ে প্রথমত, পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দ্বিতীয়ত অল্প বয়সে মা হয়ে শরীর ভেঙে পড়ছে। প্রতিটি অঞ্চলে সরকার নির্দেশ পাঠালেও বাল্যবিবাহ রোধে কেউ এগিয়ে আসছে না। তার কারণ হলো সংখ্যালঘু পরিবারগুলিতে ৫-৬টি কন্যা সন্তান থাকায় ও দরিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে পেরে না ওঠার জন্য বাবা মা তাড়াতাড়ি তাদের বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়। আর পঞ্চায়েত সদস্যরা ভোটের জন্য তাদের বিরাগভাজন হতে চায় না। এমত অবস্থায় মালদা জেলাতে ক্রমবর্ধমান বাল্যবিবাহ জেলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেমন প্রভাবিত করছে তেমনি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে (হাসপাতাল) কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে। অথচ বাল্যবিবাহ রোধে মন্ত্রী থেকে বিধায়ক কেউ কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারছে না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমামদের কোনও নির্দেশ দেওয়ার সাহসও প্রশাসন দেখাতে পারছে না, ফলে ‘জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি’ এই নীতি নিয়ে মৌলবীরা সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। শহরের শিক্ষিত পরিবারগুলি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলেও গ্রামীণ এলাকাতে এর কোনও প্রভাবই পড়েনি। মালদা জেলার সংখ্যালঘু গ্রামগুলি ক্রমশ বেড়ে চলেছে জনসংখ্যায় ও পরিবারে অথচ হিন্দু গ্রামগুলির আকার ও আয়তন তেমন বাড়েনি।

মালদা জেলা শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া জেলা হিসাবে চিহ্নিত। সামান্য শিক্ষার হার বাড়লেও সংখ্যালঘুদের উন্নতিতে রাজনৈতিক দলগুলি কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তারা অশিক্ষা ও দারিদ্রে ভুগছে। কেননা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে মাঝপথে মুসলিম ছাত্ররা পড়া ছেড়ে দিয়ে দিল্লী ও মুম্বাইয়ে কাজের সন্ধানে চলে যাচ্ছে ও মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে জনসংখ্যা ও অশিক্ষা বৃদ্ধি করে চলেছে। এইভাবে চললে আগামীদিনে মালদা জেলার উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে নারী পাচার, জাল নোটের কারবার, অনুপ্রবেশ ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের আশঙ্কা।

সমাবেশ সমাচার

বিদ্যার্থী পরিষদের বাঁকুড়া জেলার পঞ্চম সম্মেলন

গত ২৫ নভেম্বর ২০১২, রবিবার বাঁকুড়া নগরে অবস্থিত ''গান্ধী বিচার পরিষদ'' বিবেকানন্দ সভাগৃহে স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যার্থী পরিষদের পঞ্চম জেলা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। জেলার বিভিন্ন কলেজ-স্কুল থেকে প্রায় ২০০ জন কার্যকর্তা এবং অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক কিশোর বর্মন, প্রদেশ সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট বিল্লেশ্বর সিং, প্রদেশ কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস, বিভাগ প্রমুখ অ্যাডভোকেট পার্থসারথি কুণ্ডু, বিভাগ সংগঠন সম্পাদক অনুপ সাহা সহ অন্যান্য অতিথি। বাঁকুড়া শহরের রাজপথে শোভাযাত্রা এবং 'সন্ত্রাস মুক্ত দেশ-তোষণ মুক্ত ক্যাম্পাস'-এর দাবিতে মাচানতলায় প্রকাশ্য সমাবেশের মাধ্যমে একদিনের বিদ্যার্থী জেলা সম্মেলন শেষ হয়।

সংস্কার ভারতীর সর্বভারতীয় বৈঠক

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের সাধনপীঠ নাগপুর রেশমবাগ ময়দানে গত ২৩, ২৪, ২৫ নভেম্বর সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় কার্যকারণীর বৈঠক হয়ে গেল। প্রখ্যাত মারাঠী চলচ্চিত্র নির্দেশক রাজ দত্ত সহ সারা দেশের ৩০০-র অধিক প্রতিনিধি কলার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার, সমাজ-গঠন ও দেশ গড়ার দীক্ষা নিল। সবারই মন পড়ে থাকত প্রতিদিন সকালে যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর বসত সেদিকে। সেখানে মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীরা ভৈরব থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাগে সঙ্গীত পরিবেশন করে সকল প্রতিনিধির মন জয় করে নিয়েছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল সংগঠনের রীতিনীতি পরিবর্তনের চর্চার বিষয়ে। তবে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়েছে বিবেকানন্দের সার্ধজন্মশতবর্ষের বিষয়ে। সেই চর্চায় সব রাজ্যের প্রতিনিধিরাও অংশ নিয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী বাসুদেব কামাথ সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সংস্কার ভারতীর কাজকে দেশের মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিতে হবে আমাদের বলে তিনি প্রতিনিধিদের কাছে আহ্বান জানান। বিদর্ভপ্রান্তের বিশ্রাম জামদার হলেন মহামন্ত্রী (সাধারণ সম্পাদক)। গণেশ পন্থ রুড়ে হলেন সংগঠন মন্ত্রী। সমাপ্তি অধিবেশনে মধুভাই কুলকর্নী বলেন, বিবেকানন্দের ভারত গড়ার জন্য সংস্কার ভারতীর কাজকে শহরমুখী থেকে গ্রামমুখী করে তুলতে হবে। সন্ধায় ডাক্তারজীর স্মৃতি-মন্দিরে গিয়ে সবাই শ্রদ্ধা জানান।

শোকসংবাদ

সম্প্রতি মালদা জেলার নালাগোলার গন্ধহারা নিবাসী স্বয়ংসেবক বহুদিনের স্বস্তিকার গ্রাহক সত্যেন্দ্রনাথ মাহাতো সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭২ বৎসর। দীর্ঘদিন ধরে একল বিদ্যালয়ের বামনগোলা থানার সভাপতি ছিলেন এবং ডাঃ হেডগেওয়ার সেবা প্রতিষ্ঠানের একটি সেবাকেন্দ্র চালাতেন। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, পুত্রসহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবকে।

***

সম্প্রতি হুগলী জেলার গৌরহাটি নিবাসী রণজিৎ মাইতি পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি ছিলেন স্বস্তিকার একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে বর্তমান।

নেত্রদান মহাদান

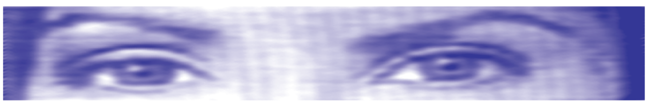

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

সুন্দর হাসি

ডাঃ দীপ্তিময় দত্ত

রোগীদের কাছ থেকে আমাদের মাঝে মাঝেই একটা প্রশ্ন শুনতে হয়। প্রশ্নটা হলো— 'কোন্ টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজবো ডাক্তারবাবু'? উত্তরটা যদিও খুব ছোট— 'যে কোনও টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজতে পারেন,' তবু সেটাকে আরেকটু ভালোভাবে বলা দরকার। দাঁত মাজার জন্য টুথপেস্ট কোম্পানি ততটা জরুরি নয়। জরুরি হলো 'কিভাবে দাঁত মাজবো'?

কেউ যদি বাজারের সবচেয়ে দামী টুথপেস্ট কিনে আঙুল দিয়ে জোরে জোরে বেশ অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজে তাহলে তার যতটা 'দাঁত মাজা' হবে তার চেয়ে অনেক ভালভাবে দাঁত মাজা হবে সে যদি যে কোনও (সস্তা বা দামী) টুথপেস্ট দিয়ে নিজস্ব প্রয়োজনমাফিক ব্রাশ দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে অনেক কম সময়ে (মোটামুটি তিন মিনিট) দাঁত মাজা শেষ করে।

দেওয়াল বা মেঝে আমরা ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করি। সেরকম দাঁতের ঝাঁটা হলো দাঁতের ব্রাশ। একটু ডিটারজেন্টে পাউডার দিলে দেওয়াল বা মেঝে একটু ভালোভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব, দাঁত মাজার ব্যাপারে টুথপেস্টের কাজও সেরকম।

এখন দাঁত মাজার নির্দিষ্ট নিয়ম কি সেটা জানা দরকার। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে টিভিতে অনেক টুথপেস্ট কোম্পানি বিজ্ঞাপনে 'দাঁত মাজা' দেখায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত দাঁত মাজা কোনও কোম্পানির বিজ্ঞাপনেই দেখিনি।

দাঁত মাজতে গেলে প্রথমেই যে জিনিসটা হাতে নিতে হবে সেটা টুথব্রাশ। কিন্তু কোন্ টুথব্রাশ হাতে নেব? বাজারে তো নানা মাপের নানা ধরনের ব্রাশ আছে। ছোটোদের জন্য বেবি-ব্রাশ এবং বড়দের জন্য বড় মাপের ব্রাশ তো আছেই। তাছাড়াও টুথব্রাশের প্যাকেটের গায়ে সফ্ট, মিডিয়াম ও হার্ড লেখা থাকে। টুথব্রাশের নাইলনের সুতোগুলো কতটা শক্ত সেটা এই লেখা দেখে জানা যায়। আমরা সাধারণত 'সফ্ট' ব্রাশ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকি। বিশেষ করে শিশুদের জন্য তো বটেই এবং যারা প্রথম 'নির্দিষ্ট নিয়মে' দাঁত মাজা শুরু করেন তাদের জন্য। নির্দিষ্ট নিয়ম রপ্ত হয়ে গেলে 'মিডিয়াম টুথব্রাশ' নেওয়া যেতে পারে। কারণ সফ্ট টুথব্রাশ বেশি তাড়াতাড়ি পাল্টাতে হয়। সবসময় পাল্টানো হয়ে ওঠে না, তাই ঠিকমত দাঁত মাজা আর হয় না। যাঁরা পান খান বা যাঁরা ধূমপায়ী, তাঁদের দাঁতে কালো বা লাল ছোপ পড়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই তাঁদের দিনে একবার খুব সতর্কতার সঙ্গে 'হার্ড ব্রাশ' ব্যবহার করা উচিত। হার্ড ব্রাশ নরম মাড়িকে আঘাত করতে পারে। মাড়ির কোনও রোগ থাকলে ডাক্তারের পরামর্শমতো 'সুপার সফ্ট' টুথব্রাশ ব্যবহার করা দরকার।

টুথব্রাশের নাইলনের সুতোগুলো যখন বেঁকে যায় তখন নতুন কেনা দরকার। যে কোনও কোম্পানির ব্রাশ কেনা যেতে পারে। তবে সেটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরি হওয়া চাই। বাঁকানো হাতল আর একগোছা নাইলনের সুতো লাগিয়ে রাখলেই সেটা টুথব্রাশ হয় না। টুথব্রাশের সবকটা নাইলনের সুতো একটা সমতলে থাকা দরকার। ছোট-বড় হলে চলবে না। অর্থাৎ পাশ থেকে দেখলে একই সরলরেখায় মনে হবে। কোনও কোনও কোম্পানি কায়দা করে এক বক্রাকার তৈরি করে। এতে একটা নতুনরকম সৌন্দর্য তৈরি হয় ঠিকই, তবে দাঁত মাজতে সাহায্য করে না, বরং উল্টোটাই। সোজা বা বাঁকানো হাতল বিশেষ তারতম্য করে না।

দাঁত মাজার জন্য যে কোনও টুথপেস্ট বেছে নেওয়া যেতে পারে, এমন কি টুথপাউডারও। তবে সেটা যেন সত্যিকারের পাউডার হয়। কিচ-কিচ করা বালির মতো হলে চলবে না। টুথপেস্ট নেবার সময় ব্রাশের উপরে না রেখে চেপে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে ভুল দেখানো হয়। টুথপাউডারের বেলায় এক হাতে রেখে অন্যহাতে ব্রাশ।

দাঁত কীভাবে মাজবো?

(১) উপরের এবং নীচের পাটির দাঁত আলাদা করে মাজতে হবে। তার মানে যখন নীচের দাঁত মাজবো, তখন কেবল নীচেরটাই মাজবো, উপরের দাঁত নয়। উপরের দাঁতের ক্ষেত্রেও তাই। দাঁতে দাঁত চেপে না রেখে মুখটা একটু খুলে দাঁত মাজতে হবে।

(২) দাঁতের বাইরের দিক, ভিতরের দিক (অর্থাৎ নীচের দাঁতের জিভের দিক এবং উপরের দাঁতের তালু বা টাকরার দিক) এবং চিবোনোর (চোয়ালের দাঁতের) দিক আলাদা করে মাজতে হবে।

(৩) বাইরের দিক এবং ভিতরের দিক মাজবার সময় ব্রাশ দাঁতের সমান্তরালে রেখে মাড়ির দিক থেকে দাঁতের দিকে মাজতে হবে। তার ফলে ব্রাশের গতি সবসময় মাড়ির গঠনকে মেনে চলবে এবং একই দিকে হবে। নীচের দাঁতের ক্ষেত্রে 'নীচ থেকে উপরে' এবং উপরের দাঁতের ক্ষেত্রে 'উপর থেকে নীচে' হবে।

(৪) চিবোনোর দিকগুলো সামনে-পিছনে করে মাজা চলবে।

দিনের মধ্যে দুবার দাঁত মাজা উচিত। বিশেষ করে রাতের খাবার খেয়ে দাঁত খুব ভালোভাবে মাজা দরকার। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নিয়ম মেনে মোটামুটিভাবে দাঁত মাজা যেতে পারে। প্রত্যেকবার খাবার পর মুখ ভালোভাবে কুলকুচি করে ধুয়ে ফেলা উচিত। লজেন্স বা চকোলেট খাবার পর ছোটোরা যদি মুখ কুলকুচি করে ধুয়ে ফেলে তাহলে খুব ভালো হয়। তবে যে কোনও পরিবেশে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে বাড়িতে লোক সমাগমে অথবা বাসে-ট্রেনে মুখ ধোয়ার ব্যাপারে ছোটোদের জোরাজুরি

করা অনুচিত। ছোটোদের উপর জোর খাটালে সাধারণত উল্টো ফল হয়।

চকোলেট লজেন্সের তুলনায় বেশি চিটচিটে, তাই দাঁতের গায়ে লেগে থাকার প্রবণতা বেশি। এই কারণে বলা হয় লজেন্সের তুলনায় চকোলেট দাঁতের পক্ষে বেশি ক্ষতিকারক। তবে দাঁত মেজে ফেলতে পারলে মোটেই ক্ষতি করে না। আর বড়দের মনে রাখা উচিত যে ছোটোদের চকোলেট খেতে দিতে হবে। চকোলেটের পুষ্টিগুণকে অবহেলা করা যাবে না। আবার সেইসঙ্গে ছোটোদের ইচ্ছাটাকেও পূরণ করা। লজেন্স বা চকোলেট বেশি খেলে দাঁতের ক্ষতি করে তা নয়। নির্ভর করে দিনের মধ্যে কতবার খাওয়া হলো তার উপর। কোনও শিশু যদি একসঙ্গে দশ-পনেরোটা লজেন্স চকোলেট খায় এবং অন্য শিশু যদি সেই দশ-পনেরোটাই সারাদিন ধরে কয়েকবার খায় তবে ক্ষতি হবে দ্বিতীয় জনেরই (হজমের ব্যাপারটা মাথায় রেখে)।

ফ্লুওরাইডযুক্ত টুথপেস্ট ব্যবহার করলে ছোটোদের দাঁতে পোকা লাগার সম্ভাবনা একটু কম। তাই বলে পোকা লাগা দাঁতকে কখনওই ভালো করতে পারে না। এমন কোনও ওষুধ নেই যা পোকালাগা দাঁতকে সারিয়ে তোলে। পোকা লাগলে তার উপযুক্ত চিকিৎসা দরকার। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে দাঁতে সত্যি-সত্যি কোনও পোকা হয় না। এটা একধরনের ক্ষয়-রোগ। এই ক্ষয়-রোগের ফলে দাঁতে গর্ত বা ক্যাভেটি তৈরি হয়। দাঁত ঠিকমতো না মাজলে দাঁতে পোকা হয় অথবা পাথর জমে গিয়ে মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে, দাঁত আলগা হয়। একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলি। কোনও এক রোগীর দাঁতে পাথর জমেছিল। এর ফলে তার মাড়ি থেকে রক্ত পড়ত— বেশি করে পড়ত দাঁত মাজার সময়। সে তার ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ানকে এই কথা জানায়। সেই ডাক্তারবাবু তাকে কোনও দাঁতের ডাক্তারের কাছে পাঠানোর পরিবর্তে টুথব্রাশ ব্যবহার বন্ধ করে আঙুল দিয়ে দাঁত মাজার পরামর্শ দেন। কিছুদিন পরে বাধ্য হয়ে তাকে ডেন্টাল হাসপাতালে আসতে হয়। পাথর জমে তার দাঁতের এমন অবস্থা হয়েছিল যে তার সামনের দিকের বেশ কয়েকটা দাঁতের চিকিৎসার কোনও উপায় ছিল না। অল্প বয়সের তার কয়েকটা দাঁত তুলে ফেলতে হলো।

টুথব্রাশ দিয়ে নিয়মমতো দাঁত মাজলে দাঁত ও মাড়ির রোগ চট করে হয় না। সবশেষে বলি শুধু শুধু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির দামী টুথপেস্ট কিনে বেশি খরচা করা কেন? তারচেয়ে বরং সম্পূর্ণ দিশি কোনও কোম্পানির টুথপেস্ট ব্যবহার করলেই তো হয়। খরচও কম হয় (সম্ভবত) আর দেশের পয়সা দেশেই থাকে। এমনকি টুথ- পাউডারও চলতে পারে— তাতে খরচ আরও কম হবে। সাধারণ টুথব্রাশ ছাড়াও ডেন্টাল ফ্লস (একধরনের সুতো) আর ইন্টারডেন্টাল ব্রাশ (ছোট বট্‌ল ব্রাশের মতো দেখতে) দিয়েও দাঁত ও মাড়ির সম্পূর্ণ পরিচর্যা করা দরকার। ডাক্তারের কাছ থেকে বিশদভাবে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা সুন্দরবন ভ্রমণ করুন ....

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো ঃ - মৃগাঙ্ক রায়

৯৭৩৪২০৬০৪০ / ৯৮০০৬৮৪২০১

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট,
ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩২৯

Email : banbhoomitravels@gmail.com

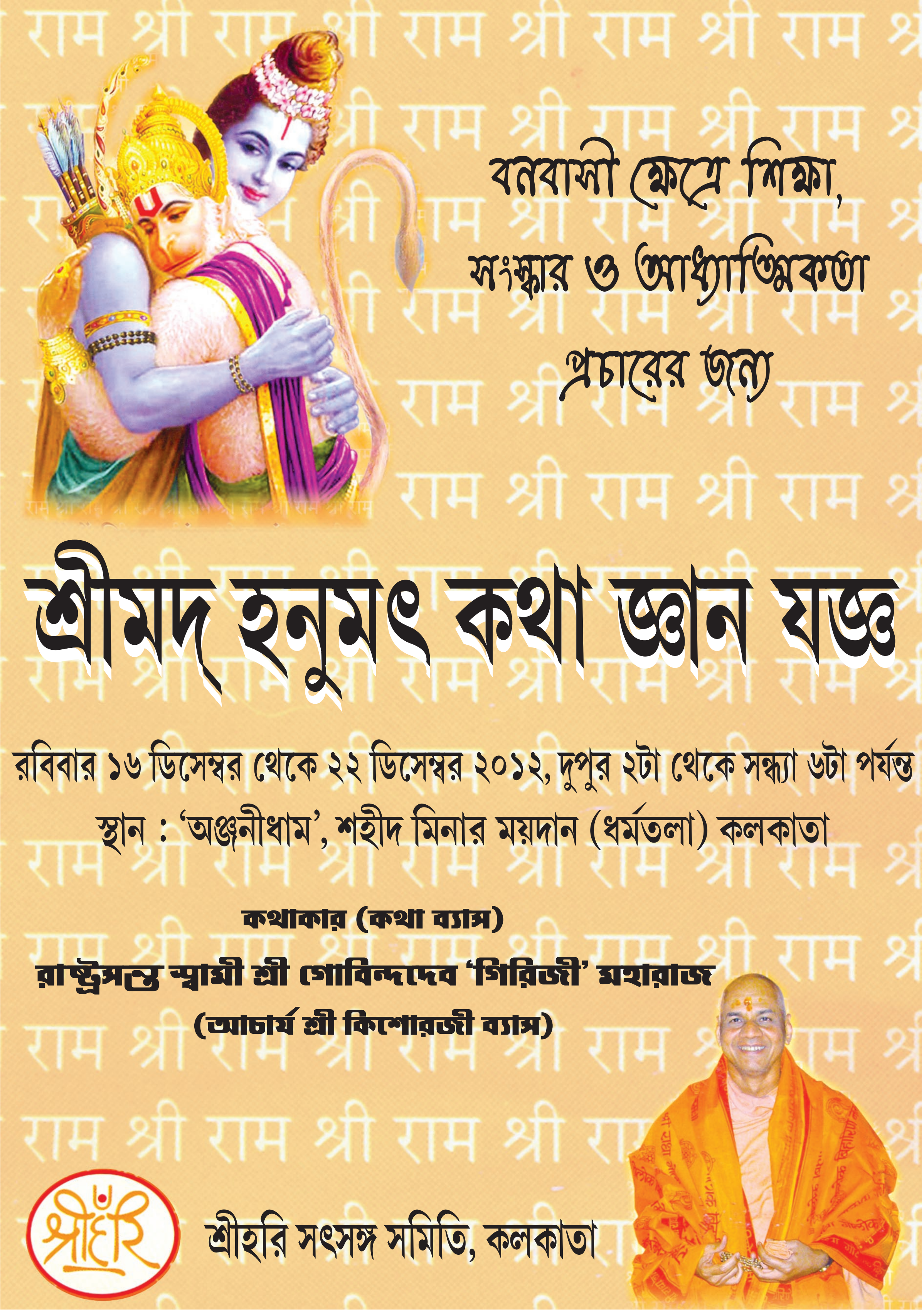
বনবাসী ক্ষেত্রে শিক্ষা,
সংস্কার ও আধ্যাত্মিকতা
প্রচারের জন্য
শ্রীমদ্ হনুমৎ কথা জ্ঞান যজ্ঞ
রবিবার ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০১২, দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
স্থান : 'অঞ্জনীধাম', শহীদ মিনার ময়দান (ধর্মতলা) কলকাতা
কথাকার (কথা ব্যাস)
রাষ্ট্রসন্ত স্বামী শ্রী গোবিন্দদেব 'গিরিজী' মহারাজ
(আচার্য শ্রী কিশোরজী ব্যাস)
শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি, কলকাতা

খেলা

বিশ্বসমাজে কলঙ্কিত ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোশিয়েশন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ললিত ভানোতের সঙ্গে সুরেশ কালমাদি। (ফাইল চিত্র)

কংগ্রেসী রাজনীতিকরা আর কতভাবে ভারতের মান-সম্মান ডোবাবেন? একের পর এক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির ঘটনা বেরিয়ে আসছে ইউপিএ নেতা-মন্ত্রীদের সৌজন্যে, আর বহির্বিশ্ব এদেশকে নিয়ে, এদেশের মানুষ, সমাজব্যবস্থা নিয়ে হাসাহাসি করছে। আর সাম্প্রতিককালে আই ও এ কর্তাদের দৌলতে যা হলো, তা বোধহয় দশহাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিসম্পন্ন এই ভারতবর্ষকে চূড়ান্ত অবমাননাকর পরিস্থিতির মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা বা আই ও এ এখন আই ও সি-র রোষানলে পড়ে আপতকালীন 'ব্যান'-এর আওতায় চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সমস্ত অ্যাথলিট ও ক্রীড়াবিদের ভাগ্য গভীর অন্ধকারে। এর ফলে আগামী ২০১৪ এশিয়াড, কমনওয়েলথ গেমস এবং ২০১৬ রিও (ব্রাজিল) অলিম্পিয়াডে দেখা যাবে না ভারতীয় প্রতিনিধি, প্রতিযোগীদের।

ঘটনার প্রেক্ষাপট হলো আই ও সি-র সনদ বা চার্টার না মেনে দিনের পর দিন আই ও এ-র কাজকর্ম পরিচালনা করা যা আদ্যন্ত দুর্নীতিতে ভরা। আর এই দুর্নীতির কুশীলব কারা? সেই কংগ্রেসী নেতারা যাঁরা আই ও এ-র সব গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কার করে বসে আছেন। একা সুরেশ কালমাদিতে রক্ষা নেই, তার দোসর জুটেছে ললিত ভানোত, অভয় সিং চৌতালারা। এই দুজনের বিরুদ্ধেই একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। কালমাদিকে লোকদেখানো শাস্তি দিয়ে সরানো হলেও সচিব পদে ভানোত ও বিনা নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে চৌতালার মনোনয়ন কোন 'স্পোর্টস কোড' মেনে হলো? এটা জানতে চেয়েছে এদেশের মিডিয়া। আর 'স্পোর্টস কোড' তো কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রকের তৈরি। এই সরকারের সব মন্ত্রকে যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের অধিকাংশই তো দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত। তাঁদের তৈরি 'স্পোর্টস কোড'-এর কী গুরুত্ব? দিল্লী হাইকোর্ট বলেছে বলে তা মেনে চলতে গিয়ে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারের গর্ভে নিক্ষেপ করে দেওয়া হলো। আই ও সি-র অনুমোদিত এবং অন্তর্ভুক্ত সংস্থা হিসেবে আই ও এ দায়বদ্ধ তাদের সমস্ত নিয়মনীতি মেনে চলার ব্যাপারে। সেখানে কেন সরকার নাক গলাবে? আর দুবছর ধরে আই ও সি বলে আসছে আই ও এ তাদের নির্বাচন পদ্ধতির আমূল সংস্কার করুক। বয়স ও কার্যকালের মেয়াদ— দু' ক্ষেত্রেই নির্দেশিকা মেনে চলুক। অথচ তা না করে বছরের পর বছর নির্বাচন নামকা-ওয়াস্তে করে একই পদে থেকে যাওয়া কোনও সভ্য দেশের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও 'স্পোর্টস কোড' নেই কেননা তা করতে গেলে আঁতে ঘা লাগবে। কংগ্রেসী নেতারাই তো একেকটা ক্রীড়া-সংস্থার মাথায় বসে আছেন আর অনাচার অপকর্মের মৌরসিপাট্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে যে সরকারটাই নড়বড়ে হয়ে যাবে। অন্যদিকে সরকারের প্রসাদ পেয়ে মিডিয়াও বিষয়টা নিয়ে বিশেষ একটা হৈচৈ করে না। সব মিলিয়ে গোলকধাঁধায় পড়ে ছটফট করেন এদেশের সিনিয়র, জুনিয়র স্তরের লক্ষ লক্ষ ক্রীড়াবিদ। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবৃত্তে ভারতের আজ কোথায় অবস্থান করা উচিত আর কোথায় তার অবস্থান! ভারতের দুবছর পর স্বাধীন হয়ে চীন আজ সত্যিই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে মহাচীন। আর ভারত ৬টি পদক পেয়েই নিজেদের ধন্য মনে করে। তাও একটিও সোনা ছাড়া। এরজন্য অবশ্য ক্রীড়াবিদ্ বা কোচেদের দোষ দিয়ে কি লাভ! যে দেশের ক্রীড়াকর্তারা আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত, দেশের সব প্রান্তে এখনও যথার্থ পরিকাঠামো ও পরিবেশ গড়ে ওঠেনি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্রীড়াবিদরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও স্বপ্নকে মূলধন করে যে ৬টি পদক আনতে পেরেছে এই তো যথেষ্ট। তাই আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় নির্বাসিত হয়ে যদি চৈতন্য ফেরে দেশের ক্রীড়া-কর্তাদের তবে তা হবে ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলজনক। অন্তত এটুকু আশা নিয়েই ভারতবাসী স্বপ্ন দেখতে পারে ২০২০-র অলিম্পিকে ভালো কিছু করার। মনে হয় ততদিনে শাস্তি মকুব হয়ে যাবে আই ও এ-র।

শব্দরূপ-৬৫০ সর্বাণী রুদ্রশর্মা

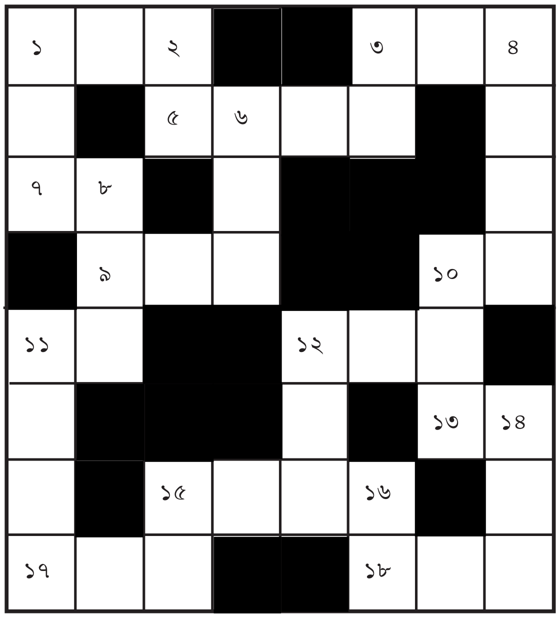

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** পৌরাণিক অসুরবিশেষ, আগাগোড়া তীর, **৩.** বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার, **৫.** রাজা জনমেজয় এই নগরীতে সর্পযজ্ঞ করেছিলেন, **৭.** নক্ষত্র, **৯.** ব্রাহ্মণদের পদবিশেষ, **১০.** রামচন্দ্রের পিতামহ, **১১.** মহাদেব, **১২.** মর্ম-র কোমল রূপ, **১৩.** রামতনয়, **১৫.** বিবিধদ্রব্য, **১৭.** রাধিকার অষ্ট সখীর একজন, **১৮.** যে পাপ কাজ করে।

উপর-নীচ : **১.** যজ্ঞাগ্নির নামান্তর, শেষ দুয়ে বন্ধু, **২.** নিযুক্ত, **৩.** বলয়, **৪.** নৃত্যরত শিব, **৬.** অতি অল্প সময়, **৮.** শ্রীরামচন্দ্র, **১০.** রবি ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকের একটি চরিত্র, শেষ দুয়ে পায়ের অলংকার, **১১.** বৃষ্ণিবংশীয় চেদি দেশের রাজা, তিনে ঠ্যাং, আগাগোড়া করকা, **১২.** প্রতিশব্দে মৌমাছি, প্রথম দুয়ে পুষ্পরস, দুয়ে-তিনে হিন্দি ভাষীর রৌদ্র, **১৪.** অতিশয় বলবান, **১৫.** জননী, **১৬.** লজ্জাশীলতা।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৩৮
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

	যা	ত	না		মা		
		পো			দ	নু	জ
প		ব	ট	ব্যা	ল		ড়
র	ত	ন		স			ভ
শু			বু		বি	দু	র
রা		চ	ক	ম	কি		ত
ম	ন্দ	র			কি		
		ক		অ	নি	ল	

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৫০ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ জানুয়ারি, ২০১৩ সংখ্যায়

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ২২

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

বিশেষ প্রতিবেদন

নজরে বিবেকানন্দ যুব শিবির

প্রস্তুতি তুঙ্গে গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে

বিরাজ রায়॥ ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে যুব শিবির। এই তো আর কটা দিন, জানুয়ারি ১১, ১২, ১৩। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে কল্যাণীর কাছে গয়েশপুর গোশালা ময়দানে হতে চলেছে এই শিবির— বিবেকানন্দ যুব শিবির। উত্তেজনায় টগবগ করছে গোটা প্রদেশ। দশ হাজার যুবকের শিবির; তাও কুড়ি বছর বাদে। ''যেতে তো হবেই, পরে আর কবে হবে...? তখন হয়তো যেতেই পারবো না''--- এমনই প্রতিক্রিয়া কতকজনের। বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষ তো দু'বার আসবে না, তাই বছরের শুরুতেই স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রয়াস এই দশ হাজার জনের মাধ্যমে। তারপর সেই স্রোতেই সারা বছর ধরে চলবে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ। আর সেজন্য শেষের অপেক্ষা নয় শুরুতেই চমক। তবে শুরুর শুরুটা হয়েছে অনেক আগেই— মার্চ মাসে যখন প্রদেশ থেকে সমস্ত পরিকল্পনা ঘোষণা হলো। আমাদের নজর সেখান থেকেই এখন পর্যন্ত। পুরো দক্ষিণবঙ্গে শিবিরের ঢেউ কেমন লেগেছে তার আঁচ পাওয়া গেল একটি প্রশ্নেই, কেমন চলছে শিবিরের প্রস্তুতি?...'এতো মেয়ের বিয়ে লেগেছে'— মুচকি হেসে জবাব বড়ো মাপের এক কার্যকর্তার।

মার্চের পর থেকে শিবিরকে লক্ষ্য করে অনেক বড়ো কার্যক্রমের তালিকা। যেন যুদ্ধের মহড়া। প্রচারক, কার্যকর্তাদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক, পরিকল্পনা। নতুন সম্পর্ক, শাখা বৃদ্ধি তো আছেই, সেই সঙ্গে পতাকা যোগ, যোগাসন সহ শারীরিকেরও অভ্যাস। বহর বেড়েছে শারীরিক বর্গেরও। ফলে ফুরসত নেই শাখার মুখ্যশিক্ষক-কার্যবাহদেরও। এরই মধ্যে বিস্তারক যাওয়ার আহ্বান। তাতে সাড়া দিয়েছে গোটা প্রদেশ থেকে ৬৫ জন যুবক। শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামে বিস্তার করছে সঙ্ঘ কাজের। অনেকে ফিরেছে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। শেষ মুহূর্তে বাদ যাচ্ছেন না বিবিধ ক্ষেত্রের বরিষ্ঠ কার্যকর্তারাও। ফলে বাতাস আরও গাঢ় হয়েছে শিবিরের বার্তায়। ১১ সেপ্টেম্বর স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা দিবসে বাইক র‍্যালি হয়েছে ছয়টি স্থানে। বাইক ছিল সাড়ে ছয়শোর উপরে। ৭১টি জায়গায় হয়েছে সাইকেলর‍্যালি, অংশ নিয়েছে ৫,৩৩৪ জন যুবক। আর মহালয়ার দিন সকালে বিগ্‌ড্রামের আওয়াজ তো সারা বাংলা শুনতে পেয়েছে। ৭০ স্থানে ৫,৫৩৪ জন স্বয়ংসেবক পূর্ণ গণবেশে অংশ নিয়েছে পথ সঞ্চলনে। তারমধ্যে ৪,৮৬৩ জনই ছিল যুবক। কলকাতার একটি ভাগ (এলাকা) অভ্যাস চালিয়ে যাচ্ছে শুধু 'ঘোষ' (ব্যাণ্ড-বিউগিল)-এর পথ সঞ্চলনের জন্য। কয়েকটি জেলাতেও তৈরী হয়েছে ঘোষবাহিনী।

পিছিয়ে নেই বৌদ্ধিক বিভাগও। তারা তো সবার আগেই ওয়েবসাইট খুলে বসেছে। তৈরি করেছে বিবেকানন্দকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও। স্কুল থেকে রেলস্টেশন, ড্রয়িংরুম থেকে অফিস ঘর সবেতেই ঝুলছে বিবেকানন্দের দেওয়াল চিত্র। তিনটি সাইজের তিরিশ হাজার ছাপা হয়েছে। বিনামূল্যে বিতরণ হয়েছে দশ হাজার। শিবিরকে উপলক্ষ করে প্রকাশিত হয়েছে দুটি পুস্তিকা; 'স্বামীজী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' এবং 'হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'। মুদ্রণ হয়েছে বাইশ হাজার। সারা দেশের দৃষ্টি এখন বাংলার দিকে— বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষে তারা কি করছে। শিবিরে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন সঙ্ঘের সমস্ত অখিল ভারতীয় কার্যকর্তারা। তাই আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। শুল্ক জমা করলেই শিবিরার্থীদের হাতে পৌঁছে যাবে শিবির সহায়িকা। প্রত্যেকের জন্য তৈরি হচ্ছে আলাদা আলাদা কোড নম্বর। আর যারা এত ব্যস্ততার মধ্যে থাকত চান না তাঁদের জন্য তো ওয়েবসাইট আছেই। www.rssbangla.com লগ অন করলেই পেয়ে যাবেন সব তথ্য। এই মহাযজ্ঞ থেকে বাদ নেই সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলিও। ভি, এইচ পি, কল্যাণ আশ্রম, বিদ্যার্থী পরিষদ, সংস্কৃত ভারতী— সবার মধ্যেই শুরু হয়েছে শিবিরকে সফল করার জন্য কোল্ডওয়ার— ঠাণ্ডা যুদ্ধ। কে, কত সংখ্যা হাজির করতে পারে শিবিরে। আন্দামান থেকেও পনেরো দিনের অধিক সময় নিয়ে ১৫-৩০ জনের একটি দল আসছে।

সাধারণ স্বয়ংসেবক থেকে কার্যকর্তা, প্রচারক দিনরাত এক করে পরিশ্রম করে চলেছেন। প্রবীণরা বলছেন— 'আমরাও তো কিছু করতে পারি, তোমরা তো খেটে খেটে আখের ছিবড়ে হয়ে গেলে। রস বার করতে জলটুকু তো ঢালতে পারি।' সেই রসের যে মিষ্টি হবে না তাদেরকে তা বোঝায় কে? তবে উৎসাহে ভাটা নেই।

এতো উৎসাহ, উদ্দীপনার মধ্যেও কিন্তু অনেকের মনের কোণে কালো মেঘ। অভিমানে মুখ ভার কচিকাঁচাদের। কারণ শিবিরার্থীদের বয়স তো বেঁধে দেওয়া হয়েছে, পনেরো থেকে চল্লিশ। পনেরো না হওয়াতে তারা শিবিরে যেতে পারছে না। তবে তোমরা একদম মন খারাপ করো না, তেরো তারিখ তো শিবির সবার জন্য খোলা। সেদিন না হয় বাবা-মার হাত ধরে চলে এসো শিবির দেখতে।

স্বস্তিকা

স্বামীজীর সার্ধজন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ৭ জানুয়ারি, ২০১৩

স্বামী বিবেকানন্দের নানা দিক নিয়ে আলোচনার সঙ্গে থাকছে নানা তথ্য। সেইসঙ্গে স্বামীজীর বিভিন্ন ধরনের ছবি। থাকছে স্বামীজীর ছবি সম্বলিত নতুন বছরের (২০১৩) রঙিন ক্যালেন্ডার।

দাম একই থাকছে— সাত টাকা

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
17 December - 2012

দাম : ৭.০০ টাকা